

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বাকচি



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Bipasshi Bhante

Courtesy by Dr. GyanaRatna MahaThera

বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য

শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বাগচী

মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

Bauddhadharma O Sahitya

By

Shri. Prabodh Chandra Bagchi

First Published : 1952

Re-printed : 2003

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫২

পুনঃ সংস্করণ : ২০০৩

Publisher :

Sri D.L.S. Jayawardana

Maha Bodhi Book Agency

4-A, Bankim Chatterjee Street

Kolkata- 700 073

Ph: 2241-9363/2219-6834

প্রকাশক :

শ্রী ডি. এল. এস. জয়বর্ধন

মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :

পঞ্চানন জানা

জানা প্রিন্টিং কনসার্ন

৪০/১বি, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন,

কলকাতা - ৭০০ ০১২

ফোন : ২২১৯-৬৮২৬

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা [Rs. 75.00]

ISBN 81-87032-44-8

সূচী

প্রথম অধ্যায় । বৌদ্ধ সাহিত্য	১
দ্বিতীয় অধ্যায় । বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র	১২
তৃতীয় অধ্যায় । হীনযান— বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক	২১
চতুর্থ অধ্যায় । মহাযান— নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন	৩২
পঞ্চম অধ্যায় । মহাযান— যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ	৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় । বজ্রযান ও সহজান	৪৭
পরিশিষ্ট	
পালি বৌদ্ধ সাহিত্য	৬১
তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিত্য	৬৫
চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য	৬৮
নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য	৭৩
মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য	৭৩
মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য	৭৪
ধর্ম্মপদ	৭৪

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধ সাহিত্য

বৌদ্ধধর্ম ইউরোপের পণ্ডিতদের দৃষ্টি যতটা আকর্ষণ করতে পেরেছে আমাদের তা পারে নি। অথচ এই ধর্ম যে ভারতীয় সভ্যতার প্রাণস্বরূপ তাতে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্মের প্রেরণা পেয়েই ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল, কাব্য ও নাট্য সাহিত্যে নূতন রসসম্ভার হয়েছিল, আখ্যানদৃষ্টিও প্রসারলাভ করেছিল। ভারতবর্ষ থেকে সাইবিরিয়া ও পারস্য থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমস্ত দেশের আখ্যানদৃষ্টির ভিতর যে আজ অবধি একটা ঐক্য দেখা যায় তা বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রেরণাতেই ঘটেছিল। ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার যদি প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই হয়ে থাকে, তবে তার ইতিহাস সাহিত্য ও দর্শন উপেক্ষা করে নিজেদের আদর্শকেই যে ক্ষুণ্ণ করছি, সে কথা জোর করেই বলা চলে। বৌদ্ধধর্ম যে নূতন ভাবধারা বইয়ে দিয়ে ভারতের প্রাণকে রসময় করে তুলেছিল সে ধারা কোথায় কি ভাবে নূতন নূতন উৎসের সৃষ্টি করেছিল তা আমাদের জানতে হবে, নইলে ভারতের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন সাহিত্য নানা ভাষায় পাওয়া গেছে। সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম ও কম্বুজে পালি ভাষায়, নেপালে সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়, এবং তুর্কীস্তানের মরুভূমিতে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও নানা স্থানীয় ভাষায়। এ ছাড়া সমস্ত বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুবাদ রয়েছে তিব্বতী, চীনা ও মঙ্গোলীয় ভাষায়। এই সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে প্রথম তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন ফরাসী পণ্ডিত Eugène Burnouf ইউজেন বুনুফ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর বই *Introduction à l'histoire du Bouddhisme Indien* প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন বৌদ্ধ সাহিত্যের কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি। প্রাচীন পুঁথির উপর নির্ভর করেই তাঁকে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় এই এক শ বছর ধরে তাঁর বই বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একখানি প্রধান গ্রন্থ হিসাবে পণ্ডিত মহলে সম্মান পেয়ে আসছে। বুনুফের সময় থেকে জার্মানী ও রাশিয়ার পণ্ডিতেরা বেশির ভাগ তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই বৌদ্ধধর্মের আলোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন যে কোনো দেশ-বিশেষের বৌদ্ধ সাহিত্য হতে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় মিলবে সেটা হবে অসম্পূর্ণ। তাই সমস্ত সাহিত্যগুলির তুলনামূলক বিচার ছাড়া বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন

ইতিহাস উদ্ধার হবে না, তা তাঁরা সহজেই বুঝতে পারলেন ।

কিন্তু ইংলণ্ডে Rhys Davids রিস্ ডেভিডস্ প্রমুখ পণ্ডিতেরা একদম উন্টো পথ ধরলেন । তাঁরা সিংহল থেকে পালি পুঁথি সংগ্রহ করে পালিতে লেখা বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর নির্ভর করে বৌদ্ধধর্মের আলোচনা আরম্ভ করলেন । তার ফল দাঁড়াল বিষময় । তাঁদের আলোচনা হল একদেশদর্শী এবং তাঁদের লেখা হল যুক্তিহীন । সিংহলের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অন্ধবিশ্বাসের ভূত তাঁদের ঘাড়ে চেপে বসল, তাই তাঁরা প্রায় সেই ভিক্ষুদের কথাই ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করলেন । তাঁদের মতে ঠিক হল যে , বৌদ্ধ সাহিত্য প্রথম পালি ভাষায় লেখা হয়, পালি ভাষা কোশল ও মগধের প্রাচীন ভাষা, আর সমস্ত পালি বৌদ্ধ সাহিত্য বুদ্ধের মৃত্যুর সময় থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-২৫০) তিন শ' বছরের মধ্যেই রচিত । এইসব বিচারহীন কথায় আর কারো ক্ষতি হোক না হোক , আমাদের খুবই ক্ষতি হয়েছে । কারণ আমাদের দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরা এইসব মতামত নির্ভুল মনে করে ও পালি বৌদ্ধ সাহিত্য খুব প্রাচীন বলে ধরে নিয়ে যেসমস্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন ও করছেন তার গোড়ায় গলদ রয়ে যাচ্ছে ।

যা হোক, পালি ভাষায় লেখা বৌদ্ধ সাহিত্য প্রাচীন না হলেও বৌদ্ধধর্ম যে প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই । এই প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের রূপ সঠিক ধরতে গেলে বৌদ্ধ সাহিত্যের সমস্ত দিকটা না দেখলে চলে না । বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু ভারতের সীমান্তদেশ ব্রহ্ম, সিংহল ও নেপালে তার আধিপত্য এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে । ভারতের বাইরে শ্যাম, কম্বুজ, অসম, চীন, জাপান, তিব্বত ও মঙ্গোলীয় দেশে তার প্রভাব এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নি । তাই এসকল দেশের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্মকে দুটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ভাগ করলেন- Northern ও Southern Buddhism । কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকে এভাবে ভাগ করা চলে না । কারণ এরূপ ভাগ শুধু দেশবিভাগের উপরই স্থাপিত, কোনো বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক মতের উপর স্থাপিত নয় । যে সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম এখন সিংহলে প্রতিষ্ঠিত তা প্রাচীনকালে উত্তরাপথেও ছিল, আর যে ধর্মমত উত্তরাপথে ছিল তার নিদর্শন প্রাচীন সিংহলেও পাওয়া যায় । প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্যেরা তাঁদের ধর্মমতকে যে দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছেন তার নাম হচ্ছে হীনযান ও মহাযান । এ বিভাগ তাঁরা ধর্মের প্রসার হিসাবে করেন নি, বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমোন্নতির পর্যায় হিসাবেই করেছেন । বুদ্ধের নির্বাণের চার-পাঁচ শ' বৎসর পরে তাঁর ধর্মমত কয়েকজন

খ্যাতনামা আচার্যদের হাতে এমন সমৃদ্ধ হল যে, সে ধর্মমতকে তাঁরা নূতন আখ্যায় অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। এঁদের মতে প্রাচীনেরা বুদ্ধের ধর্মমতের গূঢ় অর্থ ধরতে না পেরে নিশ্চেষ্টভাবে বৌদ্ধধর্মের কতকগুলি বাইরের আচার মেনে আসছিলেন। তাই তাঁরা নূতন মতের ‘মহাযান’ এবং প্রাচীন মতের ‘হীনযান’ আখ্যা দিলেন। বস্তুতঃ মহাযান যে বৌদ্ধ দর্শনের ক্রমোন্নতির একটা নূতন পর্যায় নির্দেশ করে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বলে মহাযানের উৎপত্তির সঙ্গেই যে হীনযান লুপ্ত হয়েছিল তা বলা চলে না। বৌদ্ধসংঘের একাংশ বরাবরই প্রাচীন মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাই সিংহল, ব্রহ্ম ও কম্বুজে এখনও হীনযান প্রবল। জাপানী বৌদ্ধেরা মহাযান অনুসরণ করলেও হীনযান গ্রন্থ অধ্যয়ন করে থাকেন। তা ছাড়া যে যে দেশে মহাযান প্রবল ছিল বা এখনও আছে সেখানে ভিক্ষুর বাইরের আচারব্যবহার সম্বন্ধে হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। শুধু আধ্যাত্মদৃষ্টিকে প্রশস্ত করবার জন্যই মহাযান পন্থার আবশ্যিক। তাই দেখা যায় যে, হীনযান ও মহাযান উভয়ে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত; লৌকিক ব্যবহার হিসাবেই শুধু কতকগুলি বিভাগ নির্দেশ করা চলে।

যাঁরা হীনযান বা প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করতেন তাঁদের দৃষ্টি কিছু সংকীর্ণ ছিল। তাঁদের মধ্যে একদল বুদ্ধপ্রদর্শিত আচারব্যবহার পালন করে, ধর্মপথে থেকে, পুণ্য অর্জন করতে তৎপর হতেন, কিন্তু বুদ্ধত্বলাভ করবার দূরাশা পোষণ করতেন না। তাঁদের পথকে বিশেষভাবে শ্রাবকযান বলা হত। আর একদল বুদ্ধত্বলাভ করবার আশা রাখতেন বটে, কিন্তু সে শুধু নিজের জন্যই। জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে তাঁরা চাইতেন না। সেই জন্য তাঁদের পথকে বিশেষভাবে ‘প্রত্যেকবুদ্ধযান’ বলা হত। সুতরাং হীনযানের এই দুই পর্যায় আধ্যাত্মিক উন্নতির স্তর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ভিক্ষুর বাইরের আচারব্যবহারের খুঁটিনাটি নিয়ে খুব প্রাচীনকালেই বৌদ্ধসংঘের ভিতর গোলমাল বেধেছিল। তাই প্রাচীন সংঘের ভিতর অশোকের পূর্বেই প্রায় আঠারোটি শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। এই শাখাগুলির মধ্যে দশটি শাখা কালক্রমে প্রভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে ও নিজেদের এক-একটা বিপুল সাহিত্য গড়ে তোলে। এই দশটি শাখার নাম হচ্ছে: স্থবিরবাদ (পালিতে থেরবাদ), হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাভিবাদ, মূলসর্বাভিবাদ, সম্মিতীয়, মহাসাংঘিক ও লোকোস্তরবাদ। এ দশটিকে আবার দু’দলে ভাগ করা চলে। প্রথম আটটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ খুব নিকট। মহাসাংঘিক ও তার উপশাখা লোকোস্তরবাদ খুব

প্রাচীনকালেই প্রথম আটটি থেকে বেশ দূরে সরে এসেছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের দার্শনিক দৃষ্টির সঙ্গে মহাযানের এত গুঢ় সম্বন্ধ যে, মহাযান এদের থেকে উদ্ভূত হয়েছে একথা মনে করা অসংগত হবে না।

যাঁরা মহাযান অবলম্বন করলেন তাঁদের আদর্শ হল উদার। নিজের জন্য বুদ্ধত্বলাভ করবার চেষ্টা করা বা বুদ্ধত্ব লাভ করা তাঁদের কাছে তুচ্ছ মনে হল। ভগবান বুদ্ধ যেমন সারা জগতের মঙ্গলের জন্য জন্মে জন্মে নিজেকে বলি দিয়েছিলেন, এঁরাও তাই করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের মতে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধত্বলাভ করবার বহু পূর্ব থেকে জন্মজন্মান্তর ধরে পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর সেই অবস্থাগুলিকে বোধিসত্ত্ব অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থায় বা বোধিমার্গে একবার আরুঢ় হতে পারলেই ভিক্ষু ধীরে ধীরে বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তাই মহাযান পন্থা যাঁরা অনুসরণ করলেন তাঁদের কাছে এই বোধিসত্ত্ব অবস্থাটাই কাম্য হল, অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ পরোপকারে আত্মোৎসর্গ করতে পারে সেই অবস্থাটাই তাঁদের আদর্শ হল। এই অবস্থাটা স্থায়ী করা দুভাবে সম্ভব হত। মহাযানের প্রথম আচার্যেরা মনে করতেন যে, কতকগুলি বিশেষ ‘পারমিতা’, অর্থাৎ করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি বিশেষ গুণের চর্যা করেই এ অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। দার্শনিক দৃষ্টির তারতম্য অনুসারে এঁরা দুই শাখায় বিভক্ত হলেন: মাধ্যমিক ও যোগাচার। পরবর্তী কোন কোন আচার্যেরা মনে করলেন যে, মন্ত্রশক্তির নিয়োগেও এই কাম্য অবস্থাকে স্থায়ী করা যায়। তাঁরাও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিভিন্নতা হিসাবে মোটামুটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হন। এই তিনটি শাখার নাম হচ্ছে: বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। তিনটিকে সাধারণভাবে মন্ত্রযান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

২

এইবার বৌদ্ধদের এই নানা শাখার ভিতর যে বিপুল শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল তার কিছু পরিচয় দেব। বৌদ্ধশাস্ত্র সাধারণত: তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই তিন ভাগকে তিন পিটক বা ত্রিপিটক বলা হয়। এই তিন পিটক হচ্ছে: সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক। সূত্রপিটকে বুদ্ধ কথ্যছিলেন নানা ধর্মোপদেশ দিয়েছেন; বিনয়পিটকে তিনি শিষ্যদের বিনয় বা ধর্মাচার শিখিয়েছেন; আর অভিধর্মে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের

দর্শনের কথা আছে। এই হল হীনযানের প্রধান শাস্ত্র। এ ছাড়া ত্রিপিটকের বাইরেও নানা বই আছে, সেগুলি বেশির ভাগ টীকাটিপ্পনী। হীনযানের যে দশটি শাখার নাম করেছি তাদের প্রত্যেকেরই এই ত্রিপিটক ছিল। পালি ভাষায় যে ত্রিপিটক লেখা হয়েছিল সে হচ্ছে থেরবাদ বা স্থবিরবাদের শাস্ত্র। এগুলিকে একত্রে ছাপলে প্রায় চার-পাঁচ হাজার রয়েল অকটেভো পাতা ভরে যায়। এতে বহু বিভিন্ন সূত্র: সন্নিবিষ্ট হয়েছে। হৈমবত, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক ও কাশ্যপীয়দের ত্রিপিটক মূলত কোন্ ভাষায় লেখা হয়েছিল তা বলা যায় না। কারণ তাদের ত্রিপিটক শুধু চীনা অনুবাদেই পাওয়া গেছে। তবে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ধর্মগুপ্তদের ত্রিপিটক উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাচীন ভাষায় লেখা হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার এই প্রাকৃত লেখা ধর্মপদের যে সংস্করণ পাওয়া গেছে - তা তাদের গ্রন্থ বলেই মনে হয়। সর্বাঙ্গবাদ ও মূলসর্বাঙ্গবাদের ত্রিপিটক যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই দুই শাখার প্রাচীন শাস্ত্রের যে যেঅংশ নেপালে পাওয়া গেছে তা সংস্কৃতেই লেখা। তবে এদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র চীনা তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদেই পাওয়া যায়। মহাসাংঘিক ও স্মিতীয়দের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ চীনা অনুবাদ রয়েছে, মূলগ্রন্থের অংশমাত্র নেপালে পাওয়া গেছে। এঁরা যে ভাষায় লিখতেন সেটা হল প্রাকৃতবহুল সংস্কৃত ভাষা বা মিশ্র সংস্কৃত। সুতরাং হীনযানের এই দশটা সম্প্রদায়ের মধ্যে থেরবাদের ধর্মশাস্ত্র পালিতে আর বাকি নয়টি সম্প্রদায়ের শাস্ত্র আংশিকভাবে খণ্ডিত সংস্কৃত বা প্রাকৃত পুঁথিতে, আংশিকভাবে তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় অনুবাদে এবং সম্পূর্ণভাবে চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়। চীনা অনুবাদে প্রায় পাঁচ হাজার বই রয়েছে।

এইবার এই বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্রের গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার। শাস্ত্রকারেরা যাই বলুন না কেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও তাঁদের মতাবলম্বী ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাই বিশ্বাস করুন না কেন, এমন কথা বলা চলে না যে, এই বিপুল শাস্ত্র বুদ্ধের জীবদ্দশায় বা তাঁর মৃত্যুর কয়েক শ বৎসরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। বহু শতাব্দী ধরে এর রচনা চলেছিল। বৌদ্ধশাস্ত্রের নানা দিক নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, অশোকের পূর্বে বা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্বে যে বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত হয়েছিল তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। ত্রিপিটক তো দূরের কথা, একটা পিটকও রচিত হয় নি। অশোকের একশ বছর পরেও ত্রিপিটকের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু পিটক কথাটা। তখন বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা অধ্যয়নের সুবিধার জন্য ছোট ছোট শাস্ত্রের একত্র সন্নিবেশ করতে শুরু করেছেন, এই মাত্র বোঝা যায়। অশোক তাঁর

অনুশাসনে ভিক্ষু সংঘকে কতকগুলি বৌদ্ধ সূত্র অধ্যয়ন করতে বলেছেন। তাঁর সময় যদি ত্রিপিটক থাকত তাহলে তারই নাম করতেন, কিন্তু তা না করে সাতটি সূত্রের নামোল্লেখ করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠবে, অশোকের পূর্বে বৌদ্ধশাস্ত্রের কি রূপ ছিল এবং কোন ভাষায় তা লেখা হয়েছিল। বুদ্ধ নিজে ধর্মপ্রচার করেছিলেন কোশল ও মগধ দেশে। তাঁর মৃত্যুর পর দু-তিনশ বছর ধরে, এমন কি অশোকের সময় পর্যন্ত বুদ্ধের ধর্ম এই দেশের বাইরে যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল তা মনে করবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। অশোকের চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধ নিজে ও তাঁর পরবর্তীকালে, এমন কি অশোকের সময় পর্যন্ত সংঘনায়কেরা কোশল-মগধের ভাষায় ধর্মের আলোচনা করতেন। শাস্ত্র প্রথমত সেই দেশের ভাষায় রচিত হয়। কোশল মগধের ভাষা ছিল মাগধী প্রাকৃত। জৈনরাও এই প্রাকৃতেই তাঁদের শাস্ত্র লিখেছিলেন। এই ভাষার প্রধান বিশেষত্ব ছিল ‘র’ আর ‘স’ এর প্রয়োগে। সংস্কৃতে বা অন্য প্রাকৃতে যেখানে ‘র’ ছিল, মাগধীতে সেখানে হত ‘ল’ আর পালিতে যেখানে ‘স’ ছিল, মাগধীতে সেখানে হত ‘শ’। অশোক তাঁর অনুশাসনে যে সাতখানি ধর্মগ্রন্থের নাম করেছেন সে নামগুলি মাগধী ভাষায় লেখা তাতে সন্দেহ নেই। এই দুটি বিশেষত্ব ও ভাষাতত্ত্বের অন্যান্য নিয়ম-কানুনের সাহায্যে বিচার করে দেখা গেছে যে, পালি ভাষা কোশল-মগধের প্রাকৃত নয়। এ ভাষা ছিল পশ্চিমভারতের বা খুব সম্ভবতঃ অবন্তীর কথিত ভাষার মার্জিত রূপ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে এর যে রূপ পাওয়া যায় সে রূপ যে অশোকের পূর্বের নয় বরং পরের, এই কথা ভাষাতত্ত্বজ্ঞেরা জোর করেই বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পালি ভাষার ভিতরও অনেক মাগধী শব্দ রয়েছে। সে রূপ শব্দ হীনযানের অন্যান্য শাখার সংস্কৃতে লেখা শাস্ত্রেও পাওয়া গেছে। হীনযানের নানা শাখায় ত্রিপিটক তুলনা করলেও কতকগুলি সাধারণ বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এতেই মনে হয় যে, অশোকের পূর্বেই বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা শুরু হয়। সে রচনা হত মাগধীতে বা তার মার্জিত প্রতিকরূপ অর্ধমাগধীতে। আর নানা সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক তুলনা করলে যেসব সাধারণ বিষয়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়, সেইগুলিও এই ভাষায় লেখা হত; সেইগুলি ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন শাস্ত্র। তার আকার খুব বড় ছিল না, আর তাকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম প্রভৃতি পিটক-ভাগে সাজাবার দরকার হয়নি। এই প্রাচীন শাস্ত্রের এক প্রধান বই হচ্ছে ধর্মপদ। ধর্মপদ পালি, সংস্কৃত ও ভারতের পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশের প্রাকৃতে লিখিত হয়েছিল। সেই বিভিন্ন সংস্করণগুলি তুলনা করলেই তার প্রাচীন অর্ধমাগধীরূপ ধরা পড়ে।

অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম ভারতের নানা স্থানে প্রসার লাভ করল। তখন তার প্রধান কেন্দ্র হল মথুরা উজ্জয়িনী ও কাশ্মীর। পরে কাশ্মীরে উজ্জয়িনীর স্থান গ্রহণ করেছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন অর্ধমাগধী শাস্ত্র মথুরা এবং কাশ্মীরে সংস্কৃত ও উজ্জয়িনীতে স্থানীয় প্রাকৃত ভাষায় অনুদিত বা রূপান্তরিত হল। সেই কারণেই এসব অনুবাদের ভিতর এখনও অর্ধমাগধী শব্দের সন্ধান মেলে। সংঘনায়কেরা শুধু প্রাচীন শাস্ত্র অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না, প্রাচীন শাস্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে নিজেদের সাম্প্রদায়িক মত স্থাপনা করবার জন্য শাস্ত্রের কলবের বুদ্ধি করে চললেন। তাই বৌদ্ধশাস্ত্র ক্রমশঃ বিপুল আকার নিল। তাকে পিটক-ভাগে সাজাবার দরকার হল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টম শতক পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ আচার্যেরা দলে দলে চীন দেশে গিয়ে চীনা পণ্ডিতদের সহায়তায় নানা সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে ক্রমশঃ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। এই সব ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহায্যেই সপ্তম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এবং দ্বাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সে শাস্ত্র তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষায়ও অনুদিত হল। তাই হীনযান বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এই সব দিকটা না দেখলে চলে না। তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধেও কিছু বলতে গেলে তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া গতি নেই।

৩

হীনযান শাস্ত্র ত্রিপিটকে বিভক্ত হলেও মহাযান শাস্ত্রের তা হবার কথা নয়। কারণ পূর্বেই বলেছি যে মহাযান যারা অবলম্বন করলেন তাঁরা হীনযানের বিনয়পিটকই মেনে নিলেন। কিন্তু তাহলেও বোধিসত্ত্বচর্যার জন্য যেসব আচারব্যবহার শাস্ত্রীয় বলে ধরা হল তা সাধারণ ভিক্ষুর পালনীয় আচার থেকে কিছু অন্যরূপ। বোধিসত্ত্বমার্গ যারা অবলম্বন করলেন তাঁদের বাইরের আচারের কতকগুলি খুঁটিনাটি না মানলেও চলত, কারণ তাঁদের কাছে অন্তর্দৃষ্টিরই ছিল বেশি মূল্য। এসব কারণেই কালক্রমে মহাযান শাস্ত্রেও এক নূতন বিনয়পিটকের সৃষ্টি হল। মহাযানের প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কতকগুলি সূত্র নিয়ে গঠিত। তাঁর ভিতর সবচেয়ে প্রধান হল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র। প্রজ্ঞা হচ্ছে মৈত্রী করুণা প্রভৃতির মতই এক পারমিতা। বোধিসত্ত্বমার্গে উন্নীত হতে হলে প্রজ্ঞার চর্চা ছিল খুব প্রয়োজনীয়; কারণ, তা বাদ দিলে বোধিজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র লেখা হয়েছিল সংস্কৃতে, তার পর নানা ভাষায় তার

অনুবাদও করা হয়েছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা রচনার কাল এখনও সঠিক নির্দেশ করা যায় নি। তবে মনে হয় যে, কনিষ্কের সময় বা খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই এই সূত্র রচিত হয়েছিল। অবশ্য পরে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র অবলম্বন করেই পারমিতাযান সৃষ্টি হল ও খৃষ্টীয় প্রথম শতক কিংবা তার কিছু পরে নাগার্জুন তার মাধ্যমিক এবং এর কিছু পরেই অসঙ্গ ও বসুবন্ধু যোগাচার-দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এইসব আচার্যদের রচনা কিন্তু পিটকে স্থান পেল না। প্রজ্ঞাপারমিতাকে বুদ্ধের মুখ দিয়ে শোনানো হয়েছে, কিন্তু নাগার্জুন প্রমুখ আচার্যদের রচনাশাস্ত্র-বুদ্ধের বাণী নয়। তাই তাঁদের লেখাগুলিকে ‘শাস্ত্র’ সংজ্ঞা দিয়ে পৃথক করে রাখা হল, যদিও সূত্রগ্রন্থের চেয়ে সেসব শাস্ত্র আদর কম পেল না। এই শাস্ত্র-গুলিই হল মহাযানের অভিধর্ম। মহাযানের প্রথম সূত্রপাত হয় খুব সম্ভব অমরাবতীতে। নাগার্জুন তাঁর শাস্ত্র অমরাবতী কিংবা তার অদূরে ধান্যকটকের মহাবিহারে বসে লেখেন। কিন্তু কনিষ্কের সময় গাঙ্কারও মহাযানের একটা বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শোনা যায়, মহাযানের প্রধান কবি অশ্বঘোষ তাঁর অনেক বই গাঙ্কারে বসেই লিখেছিলেন। অসঙ্গ ও বসুবন্ধুও গাঙ্কারের লোক। নাগার্জুনের সর্বপ্রধান গ্রন্থ হল প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের টীকা। এই টীকার ভিতর দিয়েই তিনি তাঁর নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করে যান। আর যোগাচারের ওপর অসংখ্য ও বসুবন্ধুর সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান-বিংশতিকা ও ত্রিংশতিকা। নাগার্জুনের বইয়ের মূল পাওয়া যায় নি, তা চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে পড়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর বইগুলির সংস্কৃত মূল নেপালে পাওয়া গেছে। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু তাঁদের বই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

এই দুই দর্শনের পুঁথিপত্র ছাড়া মহাযান শাস্ত্রের মধ্যে কতকগুলি সরস কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন, ললিতবিস্তর এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত। এ ছাড়া অশ্বঘোষের কতকগুলি ছোট ছোট বইয়েরও সন্ধান মেলে। শাস্ত্রিদেবের বোধিচর্যাবতারকে কাব্য হিসাবেই ধরা যেতে পারে। ললিতবিস্তর কার লেখা তা বলা যায় না, কিন্তু সে বই যে কাব্য তাতে সন্দেহ নেই। সে কাব্যরস আরও প্রাণস্পর্শী হয়েছে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে। অশ্বঘোষ নিজে বুদ্ধচরিতকে মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন, সেটা যে মহাকাব্য তা সে বই যারা পড়েছেন তাঁরা অস্বীকার করেন না। মহাকবি কালিদাসের কাব্যের উপর যে তার ছায়াপাত হয়েছে তা পণ্ডিতেরা জোর গলায় বলেছেন। বুদ্ধচরিতের ভাষা সরস, ছন্দে ভিতর প্রাণ আছে, উপমার ভিতর

বৈচিত্র্য আছে। আর সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র মহাকাব্যের যে যে গুণ নির্দেশ করেছেন তা সবই বুদ্ধচরিতে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ কবিগুরু বাস্মীকির নাম করেছেন। সুতরাং রামায়ণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ও তার থেকেই তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন, তা' মনে করা অসংগত হবে না। অশ্বঘোষের লেখা শারিপুত্র-প্রকরণ হচ্ছে নাটক। এ নাটকের কতকগুলি খণ্ডিত অংশমাত্র জার্মাণ পণ্ডিতেরা মধ্য-এশিয়ায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁদের যত্নেই এই নাটকের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ নাটক বুদ্ধদেবের জীবনী নিয়েই রচিত হয়েছিল। ভাসের নাটকের কথা বাদ দিলে এর চেয়ে প্রাচীন নাটক আর পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া কতকগুলি বৌদ্ধস্তোত্র, যেমন সর্বজ্ঞমিত্রের অক্ষরাস্তোত্র, বজ্রদত্তের লোকেশ্বরশতক, বা রাজা হর্ষদেবের সুপ্রভাতস্তোত্র প্রভৃতির মধ্যেও যে কাব্যরস রয়েছে তা নেহাত খেলো নয়। অক্ষরাস্তোত্র থেকে একটা নমুনা দিলেই এসব স্তোত্রের ভিতর যে কবিত্ব রয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। যেসব দেবকন্যারা মহাযানের দেবতাকে বরণ করতে ছুটেছিলেন কবি তাঁদেরই ছবি আঁকছেন—

হারাক্রান্তস্তনাস্তাঃ শ্রবণকুবলয়স্পর্ধমানায়তাক্ষ্য
মন্দারোদারবেণী তরুণপরিমলামোদমাদ্যম্ দ্বিরেফাঃ
কাঞ্চীনাদানুবন্ধোদ্ধততর-চরণোদারমঞ্জীর-তৃষা
স্বপ্নাথান্ প্রার্থয়ন্তে স্মরমদমুদিতাঃ সাদরা দেবকন্যাঃ।

“দেব কন্যারা তোমাকে স্বামীরূপে সাদরে আকাঙ্ক্ষা করছেন। মন্মথের পীড়াজনিত হর্ষে তাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। গলার হার এসে বক্ষের উপরে পড়েছে; তাঁদের আয়তলোচন শ্রবণকুবলয়কে হার মানিয়েছে। তাঁদের বেণীতে মন্দার ফুল রয়েছে তার গন্ধে ভ্রমর আকুল হয়ে উঠেছে। আর তাদের পায়ের নুপুরধ্বনি দোদুল্যমান কাঞ্চির শব্দকে ডুবিয়ে দিয়েছে।”

এই কাব্যরসই আবার অন্য দিকে ভাস্কর ও চিত্রকরের হাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের বৌদ্ধ ভাস্কর্য দেখুন, অজন্তার চিত্রকলা দেখুন, এই অপূর্ব সৌন্দর্যময়ী দেব কন্যাদের খোঁজ সহজেই মিলবে। কিন্তু অজন্তার চিত্রকর কোথা থেকে তার প্রেরণা পেয়েছিল তা স্পষ্ট বুঝতে গেলে পড়তে হবে শাস্তিদেবের বোধিচর্যাবতার। শাস্তিদেব ছিলেন বলভীর লোক, আর তিনি তাঁর বই লিখেছিলেন ষষ্ঠ শতকে। সুতরাং অজন্তার চিত্রকরেরা তাঁর কাব্য থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল

তা মনে করা অসংগত হবে না।

এইবার মহাযানের শেষযুগের শাস্ত্র সম্বন্ধে দু-এক কথা বলেই বৌদ্ধ সাহিত্যের পরিচয় শেষ করব। পূর্বেই বলেছি যে, এই যুগের একদল বৌদ্ধ আচার্যেরা বলতে শুরু করলেন যে বোধিচর্য্য মন্ত্র বলেই সম্পন্ন হতে পারে। এঁরা সপ্তম-অষ্টম শতকেই বেশ প্রভাব সম্পন্ন হয়ে উঠলেন ও নূতন নূতন শাস্ত্র রচনা করতে লাগলেন। অবশ্য এঁদের দর্শনের মূল যে যোগাচারের মধ্যেই রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। এঁরা যেসব সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন তাদের শাস্ত্র নিয়ে বেশি আলোচনা হয়নি। তা রয়েছে বেশির ভাগ নেপালী পুঁথিতে আর তিব্বতী অনুবাদে। বজ্রযান ও কালচক্রযানের শাস্ত্র সংস্কৃতে আর সহজযানের শাস্ত্র অপভ্রংশে লেখা হয়েছিল। এই অপভ্রংশ শাস্ত্রের রচয়িতারা ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁদের ভিতর সরহপাদ, কৃষ্ণ বা কাহ্নুপাদ ও তিল্লোপাদের লেখা বেশি পাওয়া গেছে। এঁদের ভাষা ও প্রাচীন বাংলা ভাষার ভিতর বড় পার্থক্য নেই- তাই এঁদের লেখা বইগুলি বাংলা ভাষার আলোচনার জন্য খুব মূল্যবান। প্রাচীন ছন্দে এঁরা যেসব নূতন সুর সংযোগ করলেন তারই প্রভাবে প্রাচীন বাংলা ও হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কবীর প্রভৃতির ভিতর এই প্রাচীন সহজসিদ্ধদের লেখার ভাব ও রূপ আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

তিল্লোপাদ যখন সমাধিস্থ হবার জন্য নিজের মনকে আদেশ করছেন-

জহি ইচ্ছই তহি জাউ মণ এথু ৭ কিজ্জই ভণ্টি।

অধ উঘাড়ি আলোঅণে জ্বানে হোইরে থিণ্টি।

“মন, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও। তোমার আর এখানে স্থান নেই। আমি অধ্যাত্মকে উদ্ঘাটিত করে এখন ধ্যানে স্থিত হব ও ধ্যানদৃষ্টি লাভ করব।”

অথবা সরহপাদ যখন সহজ- সিদ্ধির প্রাধান্য প্রতিপন্ন করবার জন্য বলছেন-

এথু সে সুরসরি জমুণা এথুসে গঙ্গাসাঅরু

এথু পআগ বণারসি এথুসে চন্দ দিবাকরু।

“এই সে সুরসরিৎ মন্দাকিনী, এই সে যমুনা, আর এই সে গঙ্গাসাগর। প্রয়াগ বারাণসী, বা চন্দ্র দিবাকরও এই।”

তখন তাঁদের ভাবের ভিতর যে ঐশ্বর্যের ও ভাষা আর ছন্দের ভিতর যে শক্তির খোঁজ পাই তা ভারতের মধ্যযুগের সাহিত্যে বিরল। অশ্বঘোষ বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন-

প্রজ্ঞাস্ববেশাং শিশীলবপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রতচক্রবাকাং।

অস্যোত্তমাং ধর্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণাদিতঃ পাস্যাতি জীবলোকঃ।

“তৃষিত জীবলোক এই উত্তমা ধর্মনদীর জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। প্রজ্ঞাস্রোতে এ নদী বেগবতী, স্থির বিনয়ব্যবহারই এ নদীর তটকে দৃঢ়, ও সমাধি এর জলকে শীতল করেছে, আর এই উত্তমা নদীর জলে ব্রতচারী চক্রবাকেরা ক্রীড়া করছে।”

বৌদ্ধধর্মের দর্শন সাহিত্য ভাস্কর্য ও চিত্রকলা বহুকাল ধরে যে আমাদের তৃষ্ণা মেটাবে তাতে আর সন্দেহ কি ? সে রত্নকে শুধু উপযুক্ত আদরে ঘরে তুলে নিতে জানা চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র

যে-বিপুল বৌদ্ধসাহিত্যের পরিচয় দিয়েছি তার তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝতে পারা যায় যে, বুদ্ধের নিজের ধর্মমত পরবর্তী কালে নানা সম্প্রদায়ের হাতে বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। যে-কোন শক্তিশালী ধর্মমতের ক্রমবিকাশে কেউ বাধা দিতে পারে না। বুদ্ধের ধর্মমত সংকীর্ণ ছিল না, সেই জন্যই বহু শতাব্দী ধরে সে-ধর্মমত প্রসারলাভ করে ছিল। প্রতিভাবান বৌদ্ধ আচার্যদের যুক্তিতর্কপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে সে ধর্মমত নিত্য নূতন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। পরবর্তী-কালে এই পল্লবিত বৌদ্ধধর্ম বিচার করবার পূর্বে আমরা বুদ্ধের নিজের ধর্মমতের আভাস দেবার চেষ্টা করব।

বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড মানতেন না সত্য, কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম নষ্ট করাই যে তাঁর ধর্মের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল এমন কথা বলা চলে না। কেউ কেউ বুদ্ধ কে সোশ্যালিস্ট আখ্যা দিয়েছেন, কেউ বা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে বুদ্ধ বর্ণ-বিভাগ ভেঙ্গে দিয়ে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব করেছিলেন। আবার অনেকে দেখিয়েছেন যে, তিনি ছিলেন পতিতপাবন, কারণ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই নীচজাতীয়। এসকল মতের কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ সোশ্যালিস্ট বা পতিতপাবন কিছুই ছিলেন না। কোন বিশেষ জাতি বা বর্ণের সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান তাঁর ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, মানুষের ব্যক্তিগত মুক্তির পথ খুঁজে বের করবার জন্যই তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দীর্ঘ সাধনায় সেপথের সন্ধান পেয়ে দশজলকে সেই পথে চালিত করবার চেষ্টাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়েছিল। এই মুক্তিমार्গ হচ্ছে গৃহত্যাগী ভিক্ষুর মার্গ, কোন বিশিষ্ট বর্ণের নিজস্ব নয়। বস্তুতঃ এই মার্গ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বানপ্রস্থ ও যতিরই রূপান্তর। এই বানপ্রস্থকেই বুদ্ধ সার্বজনীন করতে চেষ্টা করে ছিলেন। বানপ্রস্থধর্মে জাতি বা বর্ণ বিচার নেই, বুদ্ধের ধর্মেও তা নেই।

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, এমন কথাও ঠিক নয়। বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থে ব্রাহ্মণের প্রশংসাই রয়েছে। অবশ্য এ ব্রাহ্মণ সত্যকার ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করলেই এ ব্রাহ্মণ হয় না। উপনিষদে

ব্রহ্মদ্রষ্টা ব্রাহ্মণই এই ব্রাহ্মণ। ধর্মপদে বুদ্ধ বলছেন :

‘সূর্য যেরূপ দিনে, চন্দ্র রাত্রে, ও রাজা সেনানী পরিবেষ্টিত হয়ে প্রদীপ্ত হন, ব্রাহ্মণ সেইরূপ ধ্যানবলে প্রদীপ্ত হন। যিনি পাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাঁর অন্তর ও বাইরের ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ দমিত, যাঁর আত্মপর জ্ঞান নষ্ট হয়ে সমদৃষ্টি উৎপন্ন হয়েছে, যিনি মানসিক ক্রেশ, সংযোগ বা আসক্তিশূন্য তিনিই ব্রাহ্মণ।’ এই ব্রাহ্মণকে প্রহার করা, বা তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারকে বুদ্ধ গর্হিত কাজ মনে করতেন।

বুদ্ধ যে ভিক্ষুসংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁকে কতকগুলি নিয়মকানুন মেনে চলতে হত। পরিধেয় বস্ত্র, পানভোজন, ভিক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি বাইরের ব্যাপারে ভিক্ষুর নিজের স্বাধীনতা ছিল না। বুদ্ধপ্রদর্শিত বিনয়-ব্যবহারের দ্বারাই এগুলি নিয়ন্ত্রিত হত। এই বিনয়ব্যবহারকে বিধিবদ্ধ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে বৌদ্ধসাহিত্যে বিপুল বিনয়পিটকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিনয়ের মূলসূত্রগুলি বৌদ্ধধর্ম বা বুদ্ধের নিজস্ব মনে করা অসংগত হবে। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের বিধিগুলির উপরেই বৌদ্ধ-বিনয়-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচর্য পালন করা, সত্য কথা বলা, অহিংসা, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ প্রভৃতি ব্রত গ্রহণ করা উভয় ধর্মেরই মূলসূত্র। নির্দিষ্ট সময়ে লব্ধ ভিক্ষায় দেহপোষণ করা, সকল প্রাণীর উপর সমদৃষ্টি, অধ্যয়ন ও ধ্যান-ধারণায় সময় অতিবাহিত করে মুক্তিকামনা, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক উভয়েরই লক্ষ্য। সুতরাং বাইরের আচার-ব্যবহারের দিক দিয়ে যে বুদ্ধের ধর্মের একটা বিশিষ্টতা ছিল একথা মনে করবার কারণ নেই। অনেকে এইসব ভ্রান্ত মতকেই পল্লবিত করে বলতে চেয়েছেন যে, বুদ্ধের সময়ে উত্তর-ভারতে যেসব (কাল্পিত ?) গণতন্ত্র বা রিপাবলিক ছিল বুদ্ধ তারই আদর্শে নিজের সংঘকে তৈরি করেছিলেন, অর্থাৎ বুদ্ধের স্থাপিত বৌদ্ধসংঘ ছিল ক্ষুদ্র গণতন্ত্র। এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভিক্ষু হচ্ছে মুক্তিকামী বা মুক্ত। নিজের গুরু ব্যতীত আর কোনো ব্যক্তির আদেশ তাকে মানতে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় এই গুরু ছিলেন বুদ্ধ, পরবর্তী কালে সংঘনায়কেরা। বুদ্ধ নিজে কারও নির্বাচনের অপেক্ষা করেন নি। সংঘনায়কেরা নির্বাচিত হতেন ভোটে নয়, আধ্যাত্মসাধনায় যে উৎকর্ষলাভ করতেন তারই বলে।

তাহলে প্রশ্ন উঠবে, বুদ্ধের ধর্মে বৈশিষ্ট্য কোথায়। এ-বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হবে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বা দর্শনে। গল্পের কথায় বলতে গেলে বুদ্ধ মানুষের জরা ব্যাধি ও মৃত্যু দেখেই প্রথম দুঃখে অভিভূত হন; সেই সার্বজনীন দুঃখের কারণ ও

উপশমের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য গৃহত্যাগ করেন। দ্বাদশ বৎসর সাধনার পর তিনি যে বোধিজ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করলেন, তাতেই জগতের সকল রহস্য তাঁর সম্মুখে উদ্ভাসিত হল ও তিনি দুঃখের কারণ ও তার উপশমের উপায় নির্ধারণ করতে সমর্থ হলেন। এই দুঃখবাদ আলোচনা করবার পূর্বে জগতের অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে বুদ্ধ কি ধারণায় উপনীত হয়েছিলেন দেখা যাক।

উপনিষদের শিক্ষার সার মর্ম হচ্ছে, ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগৎ ও জীবের পিছনে কোনো আত্যন্তিক সত্য নেই- জীব ও প্রকৃতি শুধু প্রতিভাস মাত্র, কল্পলোকের সৃষ্টি। আত্যন্তিক সত্য হচ্ছে ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মেই জীবাত্মার একমাত্র অস্তিত্ব। বুদ্ধ এই অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রথমটা মানলেন, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটা বর্জন করলেন। বুদ্ধের দর্শনেও জীব ও প্রকৃতি বা জগৎ প্রতিভাস মাত্র। —কল্পলোকের অনিত্য বা অস্থায়ী রচনা। বুদ্ধের ভাষায়-জীব ও জগৎ কতকগুলি ‘ধর্ম’ ও ‘সংস্কারের’ প্রবাহমাত্র। এখানে ধর্ম ও সংস্কার বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ধর্মের ধাতুগত অর্থ হচ্ছে, যা ধারণ করে; আর সংস্কারের অর্থ হচ্ছে, যাদের এক সঙ্গে (সমীকৃত) করা যায়।

তাই ধর্মের অনুবাদ করা হয়েছে formation বা presentation এবং সংস্কারের অনুবাদ হয়েছে mental aggregate বা coefficient। মানুষের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বহির্জগতের যে সতত সংযোগ, তাতেই বহির্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাই এই সংযোগ বাদ দিলে বহির্জগতের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। সংযোগ নিত্য নয়, প্রতিমুহূর্তে সেই সংযোগেরও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তে ইন্দ্রিয়ের এই গ্রহণ করবার ব্যাপারকেই ধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই ধর্ম অনিত্য ও বিনাশশীল। প্রথম মুহূর্তে যে ধর্ম উৎপন্ন হচ্ছে, তার বিনাশ হয়ে পরবর্তী মুহূর্তে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হচ্ছে। নানা মুহূর্তের ধর্মের সমীকরণ করে যে কল্পলোক সৃষ্টি হচ্ছে তাই হল সংস্কার। সুতরাং এই নিয়ত পরিবর্তনশীল ধর্ম ও সংস্কারের প্রবাহেই বহির্জগতের অস্তিত্ব। অন্য সত্তা তার নেই। তাই বুদ্ধ বললেন-

সর্বম্ অনিত্যম্ সর্বম্ শূন্যম্

“সমস্তই অনিত্য ও শূন্য অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা।”

উপনিষদের শিক্ষার সঙ্গে বুদ্ধের মতের ঐক্য এই পর্যন্ত-জীবাত্মা ও পরমাত্মা

বা ব্রহ্ম এসবের অস্তিত্ব বুদ্ধ মানেন নি। জীবাশ্মাই যদি না থাকল তবে ‘আমি’ কোথায়, কে এই মিথ্যা জগতের রচনা করছে?

এই কথাই দুহাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক রাজা Menander মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মিলিন্দ নাগসেনের নাম জিজ্ঞাসা করতে নাগাসেন তার উত্তরে বললেন, লোকে তাঁকে নাগসেন বলে। বস্তুতঃ সেটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র, তাতে কোনো ‘পুদাল’ বা জীবাশ্মা বুঝায় না। তাতে মিলিন্দ বললেন, ‘একথা যদি সত্য হয় তাহলে কে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে তাঁকে পাত্র চীবর শয়নাসন ও ভিক্ষা দিচ্ছে— কেই বা সংঘের নিয়ম প্রতিপালন করে সাধনায় রত হচ্ছে ও নির্বাণলাভ করেছে। এ কথা সত্য হলে পাপ পুণ্য থাকে না—পুণ্য কাজও কেউ করে না, লোককে পীড়নও কেউ করে না। নাগসেন যখন সংজ্ঞামাত্র তখন সত্যকার নাগসেন কে? লোম, নখ, মাংস, দন্ত প্রভৃতি নাগসেন নয়, রূপ নাগসেন নয়, বেদনা নাগসেন নয়, সংজ্ঞা বিজ্ঞান সংস্কার প্রভৃতিও নাগসেন নয়—তাহলে নাগসেন নেই!’ তা’র উত্তরে নাগসেন বললেন, ‘মহারাজ, আপনি রথে চড়ে এসেছেন, রথ কি? চক্রকে রথ বলবেন কি? যুগকাষ্ঠকে রথ বলবেন কি? বা দণ্ড রশ্মি প্রতোলী প্রভৃতিকে রথ বলবেন কি? এগুলি যখন রথ নয় তখন রথ নেই—আপনি রথে চড়ে এসেছেন এ মিথ্যা কথা।’

উভয়ে শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ’লেন যে, চক্র, দণ্ড, রশ্মি প্রভৃতি অবলম্বন করে যা’কে ‘রথ’ এই ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা’কেই রথ বলা হয়। সেই রূপ লোম নখ মাংস প্রভৃতি ও রূপ বেদনা সংস্কার সংজ্ঞা বিজ্ঞান প্রভৃতি অবলম্বন করে নাগসেন এই ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—ইহা নাম মাত্র। পারমার্থিক হিসাবে দেখলে নাগসেন বলে কোনো পুদাল বা জীবাশ্মা নেই। আছে শুধু নিয়ত পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান বা চিৎশক্তির প্রবাহ। এই বিজ্ঞানসন্তান বা বিজ্ঞান প্রবাহেই জীবের বৈশিষ্ট্য বা আমিষ্য নিবদ্ধ। এই বৈশিষ্ট্য যতক্ষণ থাকছে ততক্ষণ ধর্ম ও সংস্কারের উৎপত্তি ও লয় অর্থাৎ মিথ্যা জগতের রচনা চলছে, ততক্ষণই দুঃখের অনুভূতি হচ্ছে।

জগতের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে বুদ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই তিনি প্রথমে তাঁর দুঃখবাদ প্রচার করেন। এই দুঃখবাদকে বৌদ্ধ-ধর্মের ভাষায়

আর্যসত্য (চত্বারি আর্যসত্যানি) বলা হয়। এই চারটি সত্য হচ্ছে দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায়। এই সত্যই হচ্ছে বৌদ্ধ-ধর্মের মূলসূত্র। সাধনায় বুদ্ধ যে জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করলেন তাতে তিনি দেখতে পেলেন যে, জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তির হেতু নির্ধারণ করে সেইসব হেতুকে নষ্ট করবার উপায়ও তাঁকে বের করতে হল। সত্য কথা বলতে গেলে এই বিশ্লেষণ বুদ্ধের নিজের নয়। এ হচ্ছে চিকিৎসাশাস্ত্রের চিরন্তন প্রথা-যোগ-শাস্ত্রেও এই প্রণালী অবলম্বন করা হয়েছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলসূত্র হচ্ছে রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য। চিকিৎসক রোগ দেখে প্রথমে তার হেতু নির্ধারণ করেন, আরোগ্যের আবশ্যকতা অনুভব করেন ও আরোগ্যের একমাত্র উপায় ভৈষজ্য প্রয়োগ করেন। যোগশাস্ত্রেরও মূলসূত্র হচ্ছে সংসার। সংসারহেতু, মোক্ষা ও মোক্ষোপায়। জীব দুঃখবহুল সংসারে পতিত, তার কারণ হচ্ছে প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, সেই সংযোগের নিবৃত্তিতেই মোক্ষ, মোক্ষের উপায় হচ্ছে সম্যক্ অধ্যাত্ম দৃষ্টিলাভ করা। বুদ্ধও তাই দুঃখ, দুঃখহেতু দুঃখনিরোধ ও নিরোধের উপায় স্থির করাই তাঁর নূতন ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য-মানে করলেন। যথা-

‘চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্বুহিম্-রোগো রোগহেতুরারোগ্যম্ ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রম্ চতুর্বুহিমেব, তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুর্মোক্ষো মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ প্রধান পুরুষযোগঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ সংযোগস্যাত্তিকী নিবৃত্তির্হানম হানোপায়ঃ সম্যগদর্শনম্।’

তাঁর মতে জগৎ দুঃখময়। এই দুঃখআট প্রকারের : জন্ম, ব্যাধি, জরা, মরণ, প্রিয়বিপ্রয়োগ, অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ ঈঙ্গিত বস্তু অলাভ ও পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। জীবমাত্রই এই আট প্রকারের দুঃখে অভিভূত, প্রত্যেকেরই জন্ম ব্যাধি জরা মরণ আছে, প্রত্যেককেই প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ভোগ করতে ও অপ্রিয়-জনের সংস্পর্শেও আসতে হয়। নিজের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু সব সময় সে পায় না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণীয় বস্তুও সব দুঃখজনক।

এই দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি কোথায়? দুঃখের উৎপত্তি আলোচনা করতে গিয়ে বুদ্ধ কতকগুলি কার্য-কারণের পরম্পরা নির্ধারণ করেছেন। তাঁকে বৌদ্ধ-ধর্মের ভাষায় বলা হয় ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’। এর ধাতুগত অর্থ হচ্ছে একের অবলম্বনে অন্যের উৎপত্তি, সেই জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুবাদ হয়েছে chain of dependent causation। প্রাচীন বৌদ্ধ-শাস্ত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

অস্মিন্ সতীদং ভবতি, অ্যসোৎপাদাৎ ইদমুৎপাদ্যতে

অর্থাৎ একটি কারণ ঘটলে অন্যটি ঘটে, একের উৎপত্তি হলে অন্যের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ দুঃখসমুদয়ের কারণ দেখিয়েছেন বারোটি : অবিদ্যা সংস্কার বিজ্ঞান নামরূপ ষড়ায়তন স্পর্শ বেদনা তৃষ্ণা উপাদান ভব জাতি ও জরামরণ।

অবিদ্যা হচ্ছে, অন্তরের ও বাইরের অ-জ্ঞান। জগৎ দুঃখময়, সে দুঃখের স্বভাব, দুঃখের কারণ, দুঃখোৎপত্তির কারণকে বন্ধ করার আবশ্যিকতা ও তা'র উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞানতাই হচ্ছে অবিদ্যা। কার্যকারণের পারস্পর্য ও বহির্জগতের সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে যেসমস্ত ধর্মের (formation) উৎপত্তি হচ্ছে তা না জানাও অবিদ্যা।

এই অবিদ্যার থেকেই সংস্কারের উৎপত্তি হচ্ছে। বহির্জগতের সঙ্গে দেহ বাক্য ও মনের যে প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় তাতেই সংস্কারের উৎপত্তি। এই সংস্কারের উৎপত্তির সঙ্গেই পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের কার্য আরম্ভ হয় ও বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। যখনই প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ও মনের সম্পূর্ণ যোগ স্থাপিত হয় তখনই নামরূপের উৎপত্তি হয়। বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকেই 'নাম', ও চারটি মহাভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ) ও চতুর্মহাভূতাত্মক বস্তুকেই 'রূপ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই উভয়ের উৎপত্তিতেই পুদাল বা ব্যক্তিত্বের উদ্ভব। এই নামরূপ উৎপন্ন হলেই জীবের ষড়ায়তন বা চক্ষু কণ্ঠ শোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতি ষড়েন্দ্রিয়ের আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয়। যখন ইন্দ্রিয়গুলির এই আভ্যন্তরিক শক্তির বিকাশ হয় তখনই প্রথম বহির্জগতের সঙ্গে তাদের স্পর্শ বা সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সংস্পর্শেই নানারূপ দুঃখ অদুঃখ অর্থাৎ সুখময় বেদনা বা অনুভূতির উৎপত্তি। সেই বেদনা বা অনুভূতিই হল তৃষ্ণার কারণ। তৃষ্ণা তিন প্রকারের : কামতৃষ্ণা (sensual), রূপতৃষ্ণা (formal) ও অরূপতৃষ্ণা, এই তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা আসে। উপাদানই হচ্ছে 'ভব' বা জন্মগ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষার কারণ। এই কারণ ঘটলেই জীব 'জাতি' বা জন্মান্তর গ্রহণ করে ও জরামরণ প্রভৃতিতে অভিভূত হয়। সূতরাং জীবের এই দুঃখময় সংসার(transmigration) বা আসাযাওয়ার মূলে রয়েছে এই কার্য-কারণের শৃঙ্খল। এইসব কারণের নিরোধ বা নিবৃত্তিতেই সকল দুঃখের অবসান।

দুঃখের এই হেতু নিরোধের উপায় হচ্ছে নির্বাণ। এই নির্বাণই বৌদ্ধ সাধকের প্রধান কাম্য। তাই নির্বাণের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়েই যত তর্কবিতর্কের অবতারণা ও নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ভিতর গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাণের ধাতুগত অর্থ সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। নির্বাণের এই অর্থ গ্রহণ করেই অনেকে বৌদ্ধ ধর্মকে দুঃখবাদ মনে করেছেন। সংসার যখন দুঃখময়, ইহজগতে বা পরজগতে যখন এমন কিছুই নেই যাকে অবলম্বন করে মানুষ চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারে তখন এই দুঃখময় সংসার থেকে অব্যাহতি লাভ করবার একমাত্র উপায় দেহের বিনাশ বা নির্বাণ। কিন্তু নির্বাণ যে তা নয় সে কথা সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ থেকেই বোঝা যায়। নির্বাণ দেহের বিনাশে নয়, প্রবৃত্তির বিনাশে। তাই ধর্মপদে বুদ্ধ বলছেন-

‘সারথি যেরূপ অশ্বকে দমন করে সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়কে শাস্ত করেছেন, যিনি নিরভিমান ও কলুষহীন, দেবতারাও তাঁকে ঈর্ষা করেন।’

‘যিনি সম্যক্ৰতধারী, শত্রুমিত্রে ও শুভাশুভে সমভাবাপন্ন, অনুরাগ ও বিরাগ শূন্য তিনি পঙ্কহীন হৃদের মত নির্মল ও শান্ত। তাঁর সংসার বা আসা-যাওয়া নেই’।

এই সমভাব ও শান্তির অবস্থাই হচ্ছে নির্বাণ। এ অবস্থা আনন্দের, নিরানন্দের নয়, তাই ধর্মপদে নিবৃত্ত বুদ্ধ বলছেন-

সুসুখং বত জীবাম বেরিনেসু অবেরিনো ।
 বেরিনেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অবেরিনো ॥
 সুসুখং বত জীবাম আতুরেসু অনাতুরা ।
 আতুরেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনাতুরা ॥
 সুসুখং বত জীবাম উস্‌সুকেসু অনুস্‌সুকা ।
 উস্‌সুকেসু মনুস্‌সেসু বিহরাম অনুস্‌সুকা ॥
 সুসুখং বত জীবাম যেসং নো নখি কিঞ্চনং ।
 পীতিভঙ্কা ভবিস্‌সাম দেবা আভস্‌সরা যথা ॥

বৈরিগণের মধ্যে আমরা বৈরহীন হয়ে সুখে জীবনযাপন করব, বিদ্বৈষভাবাপন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে বিদ্বৈষশূন্য হয়ে বিচরণ করব। আতুরগণের মধ্যে আমরা ক্লেশ-

রহিত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আসক্ত মনুষ্যগণের মধ্যে আমরা অনাবুদ্ধত্বলাভসক্ত হয়ে সুখে জীবনযাপন করব ও বিচরণ করব। আমাদের মধ্যে যাদের কোনো আসক্তি নেই তারা ভাস্বর দেবগণের ন্যায় প্রীতিভঙ্কা বা আনন্দ-ভাজ হয়ে সুখে জীবনযাপন করবে।’

সুগ্ধাগারং পবট্টিস্স সন্তুচিস্স ভিক্ষুনো।

অমানুসী রতী হোতি সম্মাধম্মং বিপস্সতো।।

‘যিনি শূন্যাগারে প্রবিষ্ট বা আসক্তিশূন্য হয়েছেন, যিনি শাস্তুচিস্ত, ও ধর্মের প্রকৃতরূপ দেখতে পেয়েছেন সেই ভিক্ষু অমানুষী রতি বা দিব্য আনন্দ লাভ করে থাকেন।’

নির্বাণ যে আনন্দময় সে সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। দু হাজার বৎসর পূর্বে রাজা মিলিন্দও এই সন্দেহ করেছিলেন। রাজা মিলিন্দ ছিলেন গ্রীক, তাঁর মনও সম্পূর্ণ গ্রীসীয় মন। তাই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেনকে বললেন, ‘নাগসেন, আপনি যে বললেন নির্বাণ সর্বতোভাবে সুখময় তা’ আমার মনে হয় না। নির্বাণ নিশ্চয়ই দুঃখমিশ্রিত। তার কারণ আপনিই বলেছেন যে, যাঁরা নির্বাণলাভ করেন তাঁরা দেহ ও চিত্ত ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, বাসস্থান শয়ন আহার প্রভৃতি বর্জন করেন, আয়তন বা ষড়ৈন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরিক শক্তির বিনাশ করেন এবং ধনধান্য ও প্রিয়তম জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করেন। তাই যদি নির্বাণের অবস্থা হয়, তা হলে আর নির্বাণে আনন্দ কোথায়! জগতে সুখই যাঁদের কাম্য ও যাঁরা সত্যই সুখী তাঁরা আয়তনকে অবলম্বন করেই সুখভোগ করেন। রূপময় সৌন্দর্যকে চক্ষুদ্বারা, শব্দময় গীতিবাদ্যকে শ্রবণের দ্বারা, ফুলফল প্রভৃতি গন্ধময় দ্রব্যকে ঘ্রাণের দ্বারা, খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি সুমধুর দ্রব্যকে স্পর্শের দ্বারা ও শুভাশুভ বিতর্ক মনসিকারের দ্বারা উপভোগ করেন। আর আপনারা চক্ষু শ্রবণ ঘ্রাণ জিহ্বা কায় ও মন প্রভৃতিকে হনন করে, ছেদন করে ও রোধ করে সুখ ভোগ করতে চান- এতে দেহ ও চিত্তই শুধু পীড়িত হয়, আনন্দলাভ হয় না। তাই আপনাদের নির্বাণ যে দুঃখমিশ্রিত তাতে আর সন্দেহ কি?’

এর উত্তরে নাগসেন বললেন, ‘একথা ঠিক নয়, মহারাজ, নির্বাণ সর্বতোভাবেই আনন্দময়। আপনি যাকে নির্বাণ মনে করেছেন সে শুধু নির্বাণের পূর্বভাগ, সেই অবস্থাতেই ভিক্ষু দেহ ও চিত্তকে ক্লেশময় উপলব্ধি করেন, ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও

আয়তনের বিনাশ সাধন করেন, কিন্তু ঠিক নির্বাণের অবস্থা তা নয়। আপনি যে রাজ্যসুখ উপভোগ করেন, সে সুখকে দুঃখমিশ্রিত বলা ভুল হবে। এ কথা সত্য, আপনাকে প্রত্যন্ত-রাজাদের দমন করতে হয়, মন্ত্রী-অমাত্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে প্রবাস যাপন করতে হয়, ও রাজ্যপালনের জন্য আরও বহুবিধ ক্রেশভোগ করতে হয়, কিন্তু এসব হচ্ছে রাজ্যসুখের পূর্বাংশ মাত্র। এসমস্ত কষ্টভোগ করবার পর আপনি রাজ্যসুখ উপভোগ করেন। সে সুখ তখন আর দুঃখমিশ্রিত নয়, নির্বাণের অবস্থাও তেমনি দুঃখমিশ্রিত নয়, সর্বতোভাবে আনন্দময়।

তৃতীয় অধ্যায়

হীনযান-বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক

পূর্বেই এ কথা বলেছি যে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলির বা বুদ্ধের বাণীর তত্ত্বনির্দেশ করতে গিয়ে কালক্রমে নানা দার্শনিক মতের সৃষ্টি হয়েছিল। সেসব বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের ভিতর চারটি সম্প্রদায় নিজেদের বিশিষ্ট আধ্যাত্মদৃষ্টি বা দর্শনের জন্য বৌদ্ধসংঘে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ও বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই চারটি সম্প্রদায়ের নাম হচ্ছে - বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার। ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিককে হীনযান ও মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বলতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হীনযান ও মহাযান এত ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ যে একটির বাদ দিয়ে অন্যটির পৃথক বিচার সম্ভবপর নয়। উভয়ের সম্বন্ধ অতি নিকট ও প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম। বিশেষ কোনো যুগে বৌদ্ধসংঘের ভিতর যে পরস্পরবিরোধী দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল তা মনে করা অসঙ্গত হবে। হীনযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুও যে মহাযানপন্থী হতে পারতেন তার বহু প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য বসুবন্ধু প্রথমে ছিলেন বৈভাষিক এবং জীবনের প্রথম ভাগে তিনি অভিধর্মকোষ নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা বৈভাষিকদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। পরে এই বসুবন্ধুই যোগাচারবাদ অবলম্বন করে বিজ্ঞপ্তিমাাত্রতা-নামক বিশিষ্ট দার্শনিক মত স্থাপনা করেন। সেই সময়ে তিনি যেসব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেইগুলিই হচ্ছে বিজ্ঞানবাদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব সর্বাস্তিবাদে এবং উভয়ের প্রাচীন নাম সর্বাস্তিবাদ ছিল এ কথা বলাও চলে। বস্তুতঃ সর্বাস্তিবাদের সাতখানি অভিধর্ম বা দার্শনিক গ্রন্থই বৈভাষিকদের শাস্ত্র। এই সাতখানি গ্রন্থ হচ্ছে জ্ঞানপ্রস্থান, ধর্মস্কন্ধ, সংগীতি পর্যায়, বিজ্ঞপ্তিবাদ, প্রকরণপাদ, প্রজ্ঞপ্তিসার ও ধাতুকায় পাদশাস্ত্র। জ্ঞানপ্রস্থানশাস্ত্র কাত্যায়ণীপুত্রের রচিত। তিনি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লোক, সর্বাস্তিবাদের প্রধান আচার্য। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে বসুবন্ধু অভিধর্মকোষশাস্ত্রনামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তা জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্রেরই টীকা। সর্বাস্তিবাদের অভিধর্মগ্রন্থগুলি অবলম্বন করে যেসব প্রাচীন টীকা প্রণয়ন করা হয়েছিল তাকে বিভাষা বলা হত। সেই থেকেই বৈভাষিক নামের উৎপত্তি। সুতরাং বৈভাষিক মতের সৃষ্টি যে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকেই হয়েছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সৌত্রান্তিক-মতের উৎপত্তি হয় আরও কিছু পরে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে

সর্বাঙ্গিবাদের আচার্য কুমাররাত বা কুমারলাত ও তাঁর শিষ্য হরিবর্মণ এই নূতন মতবাদ স্থাপন করেন। অভিধর্ম ও বিভাষা গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক বলে স্বীকার না করে তাঁরা বললেন যে বুদ্ধের বাণী সম্যক্ উপলব্ধি করতে হলে সূত্র-গ্রন্থগুলির শরণ নিতে হবে। কারণ তাতেই, শুধু বুদ্ধের নিজের মুখনিঃসৃত বাণী রয়েছে। কুমাররাতের প্রণীত কোনো মৌলিক গ্রন্থের খোঁজ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে হরিবর্মণের প্রণীত সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র নামক গ্রন্থের মূল বিলুপ্ত হলেও তার চীনা অনুবাদ রয়েছে। এ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমে।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক এই উভয় দার্শনিক মতেরই মূল হচ্ছে সর্বাঙ্গিবাদ। বৈভাষিকেরা সর্বাঙ্গিবাদের অভিধর্ম এবং সৌত্রান্তিকেরা সূত্রগ্রন্থ অবলম্বন করে নিজেদের মত গড়ে তোলেন ও প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বনিরূপণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁরা কি কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন এবার আমরা তাই বিচার করব।

বৈভাষিকেরা ছিলেন অস্তিবাদী বা realists। তাঁদের প্রাচীন সাম্প্রদায়িক নাম সর্বাঙ্গিবাদে সেই দার্শনিক মতই সূচিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে তাঁদের অস্তিবাদ যে জড়বাদের realism সে কথা বলা চলে না। আত্মা অথবা পৃথকালের (individuality) অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করতেন না সত্য, কিন্তু নির্বাণ যে সম্পূর্ণ আনন্দময় সে বিশ্বাস তাঁদের অটল ছিল। সে বিশ্বাসে তাঁরা প্রাচীন বৌদ্ধমতই অনুসরণ করেছেন। শুধু পঞ্চস্কন্ধ ও ধর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের আপেক্ষিক (relative) অস্তিত্ব ও বস্তুত্ব স্বীকার করতে গিয়েই তাঁরা মূল বৌদ্ধ-ধর্মের প্রদর্শিত পন্থা থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বৈভাষিকেরা ‘ধর্ম’ শব্দের যে অর্থনির্দেশ করলেন তা পাশ্চাত্য দর্শনের phenomenon-এর প্রতিশব্দ বলা চলে। যা স্বলক্ষণ বা নিজের বিশিষ্ট লক্ষণ ধারণ করে তাই হল ধর্ম। ধর্ম হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, ইন্দ্রিয়ের সেই গ্রহণ ব্যাপারেই ধর্মের বিশেষ লক্ষণসমূহ ধরা পড়ে। আর ধর্মের প্রকৃত স্বভাব-সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন না হলে মুক্তি লাভ হয়না। বসুবন্ধুর নিজের কথায় বলতে হলে-

ধর্মাণাম্ প্রবিচয়ম্ অন্তরেণ নাস্তি।

ক্লেশানাম্ যত উপশান্তয়েহভ্যুপায়ঃ।

অর্থাৎ ধর্মসমূহের স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে ক্রেশ উপশান্তির উপায় লাভ হয় না। আর ক্রেশ বা দুঃখের নিরোধ না হলে যে নির্বাণের পথ মুক্ত হয় না তা বৌদ্ধধর্মের প্রথম আলোচনাতেই দেখতে পেয়েছি। ধর্ম বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের স্বভাব পরিচ্ছেদ করতে গিয়ে বৈভাষিকেরা ৭৫টি ধর্মের অস্তিত্ব স্থাপন করেছেন। এই ধর্মসমূহকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে : সাস্রব বা মলযুক্ত এবং অনাস্রব বা মলহীন।

সাস্রব ধর্মকে সংস্কৃত ধর্ম নামেও অভিহিত করা হয়। সংস্কৃত ধর্মের অর্থ করা হয়েছে, ‘সংস্কৃত ধর্মাবুপাদিস্কন্ধপঞ্চকম্’, অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ বা রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান ও পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্মসমূহকেই সংস্কৃত বলা হয়। সংস্কৃত ধর্ম হচ্ছে সেই ধর্ম যা একীভূত এবং সত্ত্বত বা সমীকৃত (সমেতা, সত্ত্বয়) হেতুসমূহ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রতি ধর্মের উৎপত্তির পিছনে নানা হেতুর সমাবেশ রয়েছে-প্রতি ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সংযোগে উদ্ভূত হয়। এই জন্যই একটি সংস্কৃত শ্লোক পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের মূলমন্ত্রভাবে গৃহীত হয়েছিল-

যে ধর্মা হেতুপ্রভবা হেতুন্তেষাং তথাগতঃ।

হ্যবদন্তেষাঞ্চ যো নিরোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।

অর্থাৎ ধর্মসমূহ হেতুপ্রভব। তথাগত বা বুদ্ধ তাদের হেতু ও নিরোধোপায় নির্দেশ করে গিয়েছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অবলম্বন করেই সংস্কৃত ধর্মের উৎপত্তি হয়। আর ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা যা গ্রহণ করা অসম্ভব এবং যা অহেতুকী তাকেই অসংস্কৃত বা অনাস্রব ধর্ম বলা হয়। এই জন্য ইউরোপীয় ভাষায় এ দুই শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে conditioned (সংস্কৃত) ও unconditioned (অসংস্কৃত)। সংস্কৃত ধর্মের সংখ্যা ৭২ আর অসংস্কৃতের সংখ্যা ৩। এই ৭২টি সংস্কৃত ধর্মকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে : রূপ চিন্তা ও চিন্তাবিপ্রযুক্ত। পঞ্চস্কন্ধ থেকেই এদের উদ্ভব। পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে : রূপ বেদনা সংজ্ঞা সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ ও চিন্তাধর্ম, রূপ ও বিজ্ঞান এই উভয় স্কন্ধকে অবলম্বন করে উদ্ভূত হয়। আর চিন্তা ও চিন্তাবিপ্রযুক্ত ধর্মসমূহের উদ্ভব হয় বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় করে।

রূপ হচ্ছে একাদশ প্রকারের : পঞ্চেন্দ্রিয় বা গ্রাহক এবং তাদের প্রত্যেকের গ্রাহ্য

বিষয় অর্থাৎ চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা ও কায়, আর তাদের গ্রাহ্যধর্ম, রূপ শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ। এই শ্রেণীর আর একটি ধর্ম হচ্ছে অবিজ্ঞাপি ^{সং} ^{সি} পঞ্চেন্দ্রিয়ের শক্তির জাগতিক ^{অবস্থা} ^{বজ্ঞানবহির্ভূত} ধর্ম। ^{অবস্থায়} ^{সে} ধর্মের উপলব্ধি হয়না, ইন্দ্রিয়শক্তির শুধু ^{বিস্তার} ^{অবস্থাতেই} তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবিজ্ঞাপ্তি ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বসুবন্ধু বলেছেন-

বিজ্ঞাপ্তিচিন্তকস্যাপি যোহনুবন্ধঃ শুভাশুভঃ।

মহাভূতান্যুপাদায় সা হ্যবিজ্ঞাপ্তিবুচ্যতে ॥

অর্থাৎ চিন্তের বিজ্ঞাপ্তি অবস্থাতে ও মহাভূতগুলিকে অবলম্বন করে যে শুভাশুভ ধর্মের অনুবন্ধ বা প্রবাহ (serial continuity) ঘটে তাকেই অবিজ্ঞাপ্তি ধর্ম বলা হয়। মহাভূত চারটি : পৃথিবী অগ্নি তেজ ও বায়ু এবং তারাই হচ্ছে অবিজ্ঞাপ্তি ধর্মের উৎপাদ-হেতু। সমাধির কোনো কোনো অবস্থায় চিন্ত যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখনও অবিজ্ঞাপ্তি ধর্মের আবির্ভাব হতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত ধর্ম হচ্ছে চিন্ত। চিন্ত মন ও বিজ্ঞান একার্থক। চিন্তধর্ম ৬টি: চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ জিহ্বা ও কায়াত্মক পঞ্চবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের কোনোটিই চিন্তের বহির্ভূত নয়। বিজ্ঞান-পঞ্চক ও মনোবিজ্ঞান চিন্তের অঙ্গ এবং চিন্ত হচ্ছে সর্বসাধারণ বিজ্ঞান বা **sensorium commune**। সেইজন্য বসুবন্ধু বলেছেন, 'ষণ্ণাম্ অনন্তরাতীম বিজ্ঞানম্ যদ্বি তন্মনঃ'-মন বা চিন্তকে কখনো কখনো রাজা বলা হয়েছে কখনো বা তাকে বৃক্ষের কাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে অন্যান্য বিজ্ঞানগুলিকে বলা হয়েছে-পাতা ফুল ও শাখা। ধর্মপদের প্রথম শ্লোকে মনের ঐ অর্থই গ্রহণ করা চলে-

মনো পুরুষমা ধম্মা মনো সেট্টা মনোময়া।

অর্থাৎ ধর্মসমূহ মনো-পূর্বগামী, মনো-শ্রেষ্ঠ ও মনোময়। সকল ধর্মই হচ্ছে মনের বশবর্তী।

তৃতীয় শ্রেণীর সংস্কৃত ধর্ম হচ্ছে চৈতন্যধর্ম বা চিন্তের বিষয়ীভূত ধর্ম। চৈতন্য ধর্মের সংখ্যা ৪৬ ও সেগুলি ছয় ভাগে বিভক্ত-

১. চিত্তমহাভূমিক ধর্ম : ১০
বেদনা সংজ্ঞা চেতনা স্পর্শ ছন্দ মতি স্মৃতি মনস্কার অধিমুক্তি ও সমাধি
২. কুশলমহাভূমিক ধর্ম : ১০
শ্রদ্ধা অপ্রমাদ প্রশঙ্খি উপেক্ষা হ্রী অপত্রপা অলোভ অদ্বेष
অহিংসা ও বীর্য;
৩. ক্লেশমহাভূমিক ধর্ম : ৬
মোহ প্রমাদকৌসীদ্য অশ্রাদ্ধ্য স্ত্যান ও ঔদ্ধত্য;
৪. অকুশলমহাভূমিক ধর্ম : ২
অহীকতা ও অনপত্রপা;
৫. উপাক্লেশভূমিক ধর্ম : ১০
ক্রোধ অক্ষ মাৎসর্য ঈর্ষা প্রদাশ বিহিংসা উপনাহ মায়া শাঠ্য ও
মদ ;
৬. অনিয়তভূমিক ধর্ম : ৮
বিতর্ক বিচার কৌকৃত্য রাগ মান বিচিকিৎসা প্রভৃতি।

পূর্বেই বলেছি চৈত্ত ও চিত্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম, বেদনা সংজ্ঞা ও সংস্কার এই তিন স্কন্ধকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়। বেদনা অনুভব বা অনুভূতি একার্থক। এই অনুভূতি সুখদুঃখময় হতে পারে এবং সুখদুঃখহীনও হতে পারে। আর বস্তুর স্বভাবগ্রহণেই সংজ্ঞার উৎপত্তি-‘সংজ্ঞা নিমিত্তোদগ্ৰহণাঙ্গিকা। বস্তুর অথবা-বিশেষকেই নিমিত্ত বলা হয়েছে, আর তার উদগ্ৰহণ বা পরিচ্ছেদই (determination) হচ্ছে সংজ্ঞা। আর সংস্কার-স্কন্ধের উৎপত্তি হয় প্রকৃতপক্ষে অন্য চার স্কন্ধকে আশ্রয় করে-‘সংস্কারস্কন্ধচতুর্ভোহন্যো সংস্কারাঃ’। সুতরাং এই যদি তিনটি স্কন্ধের স্বভাব হয় তাহলে প্রথম পাঁচ প্রকারের চৈত্ত ধর্ম যে তাদের থেকেই উৎপন্ন তা সহজেই বোঝা যায়। তাদের মহাভূমিক বলা হয়েছে তার কারণ তারা চিত্ত থেকেই উদ্ভূত। ভূমির বিশেষ অর্থ হচ্ছে উৎপত্তিবিষয় অর্থাৎ যে স্থান থেকে উৎপত্তি হয়। চিত্ত থেকে সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি বলেই মহাভূমি হচ্ছে চিত্ত।

যেসব ধর্ম চিত্তের সমস্ত ক্রিয়াকেই আশ্রয় করে তাদের মহাভূমিক ধর্ম বলা হয়েছে। বেদনা বা নানা প্রকারের অনুভব, চেতনা বা চিত্তপ্রসাদ (that which

conditions the thought) সংজ্ঞা ('বিষয়নিমিত্ত গ্রহণ'), ছন্দ ('অভিপ্রেতে বস্তুনি অভিলাষ'), স্পর্শ, (' ইন্দ্রিয়-সন্নিপাত'), মতি বা প্রজ্ঞা (' বস্তুনি প্রবিচয়'), স্মৃতি, মনস্কার (' আলম্বনে চেতস আবর্জনম্ অবধারণং') ও সমাধি (চিন্তেকাগ্রতা) চিন্তের সমস্ত ক্রিয়াতেই বিদ্যমান। সেই জন্যই এগুলিকে চিন্তা ধর্ম বলা হয়েছে।

চিন্তের কুশলী অবস্থাতে যেসব ধর্মের উদ্ভব হয় তাদের কুশলমহাভূমিক আখ্যা দেওয়া হয়-শ্রদ্ধা (' চেতসঃ প্রসাদঃ'), অপ্রমাদ বা কুশলধর্মের অবহিততা, প্রশঙ্খি বা চিন্তলাঘব (' চিন্ত-কর্মণ্যতা'), উপেক্ষা বা চিন্তসমতা, হ্রী (গৌরবতা), অপত্রতা (' অবদ্যো ভয়দর্শিত্বম্'), অলোভ, অদ্বेष (মৈত্রী), বিহিংসা ও বীর্য ('চেতসোহ ভ্যৎসাহঃ')।

ক্লেশমহাভূমিক ও অকুশলমহাভূমিক ধর্মসমূহ প্রকৃতপক্ষে কুশল মহাভূমিক ধর্মসমূহের বিরুদ্ধাচারী ধর্ম। শ্রদ্ধার অভাবে মোহ বা অবিদ্যা, অপ্রমাদের অভাবে প্রমাদ, বীর্যের অভাবে কৌশীদা, প্রশঙ্খি বা চিন্তলাঘবতার অভাবে স্ত্যান বা অকর্মণ্যতা, ঔদ্ধত্য, হ্রীর অভাবে অনপত্রপা প্রভৃতি ধর্মের উৎপত্তি হয়।

উপক্লেশমহাভূমিক ধর্মগুলিও অকুশল-ধর্মের বিরুদ্ধাচারী। ক্রোধ, স্রক্ষ বা শত্রুতা, মাৎসর্য, ঈর্ষা প্রভৃতি ধর্ম ও চিন্তের অকুশল অবস্থায় উৎপন্ন হয়। আর অনিয়তভূমিধর্ম চিন্তের কুশল ও অকুশল দুই অবস্থাতেই উদ্ভূত হতে পারে। আর-এক শ্রেণীর সাংস্কৃত ধর্মকে বলা হয় চিন্তাবিপ্রযুক্ত সংস্কার, অর্থাৎ যে ধর্মের চিন্তা ও রূপের কোনোটির সঙ্গেই যোগাযোগ নেই। পূর্বেই দেখেছি যে চিন্তাবিপ্রযুক্ত ধর্ম সংস্কার-স্কন্ধকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়, এবং তাদের সংখ্যা ১৪ : প্রাপ্তি, অপ্ৰাপ্তি, সভাগতা, আসঙ্গিক, সমাপত্তি, জীবিত, লক্ষণ ও নামকায় ইত্যাদি। এসব ধর্মের বস্তুত্ব নেই, তারা চৈতন্যধর্ম নয়, তবে চৈতন্যের সহিত তাদের ভাবসাদৃশ্য আছে। প্রাপ্তি দুই প্রকারের: লাভ ও সমন্বয়। (asquisition) এবং (possession)। ধর্ম, আশ্রয়, স্কন্ধ, আয়তন প্রভৃতির লাভ ও সমন্বয় কার্যকে 'প্রাপ্তি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রাপ্তিসংস্কার স্ব স্ব ধর্ম-প্রবাহকেই অপেক্ষা করে, অন্যের কর্মকে আশ্রয় করে না। সভাগতা বা নিকায়-সভাগতাও একপ্রকারের ধর্ম; সাধারণতঃ নানা বস্তু বা বস্তুসমূহের ভিতর যে সাম্যের বা সাদৃশ্যের অনুভূতি হয় তার হেতু হচ্ছে সভাগতা সংস্কার। আসঙ্গিক সংস্কার চিন্তা ও চৈতন্যপ্রবাহের নিরোধ উৎপন্ন করে। সেইজন্য এই ধর্মকে নদীস্রোত-নিরোধের সঙ্গে তুলনা করা হয় ('নদীতোয়-নিরোধবৎ')। সমাপত্তি হচ্ছে মহাভূতের সমতা উৎপাদন ('মহাভূত-সমতাপাদনম্')। চিন্তা প্রভৃতি ধর্মপ্রবাহ নিরুদ্ধ হলে চিন্তের যে সমতা উৎপাদিত হয় তাকেই সমাপত্তি বলা হয়। ধ্যান সমাধি

প্রভৃতি সমাপত্তিরই নামান্তর। সেইজন্য সমাপত্তি দুই প্রকারের অসংজ্ঞি ও নিরোধ সমাপত্তি, অর্থাৎ আসংজ্ঞিক ও নিরোধ-সংস্কারের সংগ্রহ। মোক্ষকামীর পক্ষেই এ দুই ধর্ম উৎপাদন সম্ভবপর। ‘জীবিত’ ও একপ্রকার ধর্ম, ‘জীবিত’ ও আয়ুস্ উভয়েই একার্থক। এ সংস্কারের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মপ্রবাহের স্থিতি নিরূপিত হয়। সুতরাং এই ধর্মই হল বসুবন্ধুর মতে ‘আধার উদ্ভাবিজ্ঞানয়োঃ’-অর্থাৎ আয়ুঃই হচ্ছে উদ্ভাতা ও বিজ্ঞানের আধার বা আশ্রয়স্থান। আয়ুর এই অর্থ নির্ধারণে বসুবন্ধু বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেছেন-

আয়ুর উষগথ বিজ্ঞানম্ যদা কায়ম্ জহত্যমী।

অপবিদ্ধ তদা শেতে যথা কাষ্ঠমচেতনঃ ॥

অর্থাৎ যখন আয়ু, উষগ ও বিজ্ঞান কায়াকে পরিত্যাগ করে তখন তার অচেতন কাষ্ঠখন্ডের ন্যায় অবস্থা উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ হচ্ছে জাতি জরা স্থিতি ও অনিত্যতা এই চারটি। এ চারটি প্রত্যেকেই এক-একটি ধর্ম।

আর তিনটি চিস্তবিপ্রযুক্ত ধর্ম হচ্ছে : নামকায় পদকায় ও ব্যঞ্জনকায়। সংজ্ঞা বাক্য ও অক্ষর থেকে এই তিন সংস্কারের উৎপত্তি। নামের সাহায্যে সংজ্ঞাকরণ, ও পদের সাহায্যে অর্থ পরিসমাপ্তি হয়, আর ব্যঞ্জন বা অক্ষর হচ্ছে লিপির হেতু। সুতরাং এই তিনটিও ধর্মবিশেষ।

এইবার অনাস্রব বা অসংস্কৃত ধর্ম কোনগুলি তার বিচার করা যাক। পূর্বেই বলেছি যে, যে ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তাই হচ্ছে অসংস্কৃত (unconditioned) ধর্ম। অসংস্কৃত ধর্ম তিনটি—‘আকাশম্ দ্বৌ নিরোধৌ চ’ অর্থাৎ আকাশ এবং দুই প্রকারের নিরোধ—প্রতিসংখ্যা নিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ।

আকাশের অর্থ হচ্ছে অনাবৃত্তি। যা রূপ বা বস্তু (matter) দ্বারা আবৃত হয়না এবং রূপ বা বস্তুকে আবৃত করে না তাই হচ্ছে আকাশ। আর প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ নির্বাণেরই অঙ্গ। প্রতিসংখ্যা নিরোধ হচ্ছে সাস্রব ধর্ম-সমূহের প্রত্যেকের পৃথকভাবে নিরোধ বা বিসংযোগ-‘বিসংযোগঃ পৃথক্ পৃথক্’। এই বিসংযোগ বা নিরোধের ধর্মত্ব বা দ্রব্যত্ব (entity) আছে, এবং সে ধর্মত্ব অন্য ধর্মের আশ্রয়ে প্রত্যুৎপন্ন নয়, নিত্য। সেই জন্যই নিরোধ আর্যসত্য হিসাবে গণ্য হয়। প্রতিসংখ্যা

হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং প্রজ্ঞার সাহায্যে সাস্রব ধর্মসমূহের স্বভাবসম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করাই হচ্ছে প্রতিসংখ্যা নিরোধ। আর যে নিরোধ ধর্মোৎপত্তির আত্যন্তিক বিঘ্ন ঘটায় তা হচ্ছে অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ ('উৎপাদাত্যন্তবিঘ্নঃ')। প্রজ্ঞার সাহায্যে পৃথক পৃথক সাস্রব ধর্মের প্রকৃত স্বভাব-অবগতিতে এ নিরোধ নয়, যখন ধর্মোৎপত্তির হেতুসমূহ বিনষ্ট হয় ('প্রত্যয়বৈকল্যাৎ') তখনই এই নিরোধ ঘটে। সুতরাং এই নিরোধই হচ্ছে বৈভাষিকদের মতে বৌদ্ধসাধকের কাম্য। কারণ এতেই আত্যন্তিক নির্বাণ লাভ হয়। বস্তুতঃ যখন সাস্রব ধর্মসমূহের উৎপাদ বিনষ্ট হয় তখনই তিনটি অসংস্কৃত ধর্মের উৎপত্তি হয়। ধর্মশূন্যতাই হচ্ছে অসংস্কৃতত্রয়ের লক্ষণ।

বৈভাষিকদের এই ধর্মপরিচ্ছেদের পিছনে রয়েছে অস্তিবাদ। কিন্তু এই অস্তিবাদে সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ কিম্বা আত্মার কোনো স্থান নেই। রূপের (form or matter) বস্তুত্ব এবং পরমাণুরও বস্তুত্ব আছে বটে, কিন্তু সে পরমাণুর কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। এই খানেই বৈশেষিকের সঙ্গে বৈভাষিকের বিরোধ। বৈভাষিকের পরমাণু দ্রব্যপরমাণু (atom, monad) নয়, তা'র কোনো দ্রব্যত্ব (substantiality) নেই। সে পরমাণু হচ্ছে সংঘাতপরমাণু, অর্থাৎ সংঘাত বা রূপ-সংঘাতের (aggregate of matter) সূক্ষ্মতম অবস্থা। রূপ সংঘাতের সেই সূক্ষ্মতম অবস্থাও স্বলক্ষণবিশিষ্ট। তা'র লক্ষণ হচ্ছে আটটি : চতুর্মহাত্ম বা ক্ষিতি, অপ, বায়ু ও চতুর্ভৌতিক বস্তু-রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ। সুতরাং এই পরমাণুর কোনো আত্যন্তিক সূক্ষ্মতা (ultimate simplicity) নেই। বৈশেষিকের পরমাণুর নাশ নেই, কিন্তু বৈভাষিকের সংঘাতপরমাণু স্বল্পস্থায়ী, তার বিনাশ হলে তৎসদৃশ অন্য পরমাণু তার স্থান গ্রহণ করে। প্রতি সংঘাত-পরমাণুর উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হেতু-পরম্পরার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

চিন্তা ও চৈতন্যধর্মের (mind ও mental phenomena) সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। চিন্তা বা মনেরও কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। বিজ্ঞানের উৎপত্তিতেই মনের অস্তিত্ব। বিজ্ঞানও স্বল্পস্থায়ী; এক বিজ্ঞানের লয় হলে নূতন বিজ্ঞান তার স্থান গ্রহণ করছে। তাদের উৎপত্তি ও স্থিতি হেতু-পরম্পরার দ্বারা নির্দিষ্ট। ভূতপূর্ব বিনষ্ট বিজ্ঞানই পরবর্তী মুহূর্তে জাত বিজ্ঞানের আশ্রয় হিসাবে গৃহীত হয় ও সেই জন্যই তাকে মন আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং চিন্তা চৈতন্যধর্ম 'সংস্কৃত' লক্ষণ নিয়েই উৎপন্ন হয়।

কোনো ধর্মই একটিমাত্র হেতু থেকে উদ্ভূত ('একহেতুসম্বৃত') নহে। প্রতি ধর্মই অন্য কোনো ধর্মের কারণ-হেতু। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের (causality) পৌর্বাপর্য ও সহভাবিত্ব (co-existence) দুইই আছে। প্রদীপ আলোক ও বৃক্ষছায়ার কারণহেতু তা'দের যেরূপ প্রতীত্য-সমুৎপন্নত্ব আছে তেমনি সহভাবিত্বও আছে। এইখানে বৈভাষিকদের সৌত্রান্তিক-মতের সঙ্গে বিরোধ; সৌত্রান্তিকেরা ধর্মসমূহের সহভাবিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে এক ধর্ম বিনষ্ট হয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়।

পূর্বেই দেখেছি যে বৈভাষিকেরা অসংস্কৃত ধর্মত্রয়কেও ভাবস্বভাব (positive) ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন। এখানেও সৌত্রান্তিকের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ। সৌত্রান্তিক-মতে অসংস্কৃতত্রয় অভাবস্বভাব (negative)। তাঁরা স্প্রষ্টব্য বা স্পর্শ করবার বস্তুর অভাবকেই আকাশ এবং জাতি এবং অনুৎপাদের অভাবকেই নির্বাণ বলেন। সুতরাং সৌত্রান্তিকের নির্বাণ হচ্ছে অবস্তক (unreal) আর বৈভাষিকের নির্বাণ বাস্তব, অনাস্রব ও আনন্দময় অবস্থা।

প্রথমেই বলেছি যে বৈভাষিকমতে আত্মা বা পুদালের কোনো অস্তিত্ব নেই। রূপী ও অরূপী ধর্মের অর্থাৎ স্কন্ধ ও মহাভূতের সংযোগে জীবের উৎপত্তি। আর তার আত্মা বা বৈশিষ্ট্য বলতে বুঝতে হবে শুধু ধর্মসমূহের সমাবেশ। সৈন্য পিপীলিকাশ্রেণী স্রোতস্বিনী প্রভৃতির সঙ্গে এই জীববৈশিষ্ট্যের তুলনা করা হয়। নানা সৈনিকের একত্র সমাবেশে সৈন্যদল ও নানা পিপীলিকার সমাবেশে পিপীলিকা-শ্রেণী গঠিত; তা'দের পরস্পরের ভিতর কোনো নিত্য বা স্থায়ী সম্বন্ধ নেই। স্রোতস্বিনীও তেমনি হচ্ছে জলের পূর্বাপর অনুসৃতি ও সে অনুসৃতিও নিত্য নয়, অনিত্য। সুতরাং আত্মা বা পুদালের কোনো বাস্তবিক অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু হেতুসম্বৃত ধর্ম, স্কন্ধ আয়তন বিজ্ঞানের উৎপত্তি বিষয় ও ধাতু বা ভূত (elements)। গভীরভাবে প্রণিধান করলে উপলব্ধি হয় যে আত্মা নেই, সেখানে আছে শুধু শূন্য। বৈভাষিকেরা এ বিষয়ে প্রায় শূন্যবাদীদের সমধর্মী হয়ে পড়েছেন, কিন্তু সে কথা পরে বিচার করবো। এইবার সৌত্রান্তিক-মতের পরিচয় দিয়েই এ অধ্যায় সমাপ্ত করি।

বৈভাষিক-মতে আত্মা নেই বটে কিন্তু ধর্মের অস্তিত্ব আপেক্ষিক হলেও আছে। সে ধর্মের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস আছে। অর্থাৎ বর্তমান ধর্মের পিছনে রয়েছে একটা হেতু ও সে হেতুও হচ্ছে ধর্মসংঘাত। বর্তমান কালের ধর্ম-সংঘাতও ভবিষ্যৎ ধর্মসমূহের কারণ-হেতু। কিন্তু সৌত্রান্তিকেরা এর কিছুই স্বীকার করেন নি,

আত্মা বা পুদালশূন্যতা ও ধর্মশূন্যতাই হচ্ছে তাঁদের মতের দুটি মূলসূত্র। শূন্য ঘটের ভিতর যেমন কোনো বস্তুই অস্তিত্ব নেই, স্কন্ধ ও ভূতাত্মক দেহের ভিতরেও তেমনি কোনো আত্মা নেই। ঘটের অস্তিত্ব ব্যাবহারিক সত্যমাত্র, পরমার্থতঃ তারও কোনো সত্তা নেই। ঘট হচ্ছে সংজ্ঞা মাত্র। এ কথা আরও স্পষ্ট করে বলা যাক। সৌত্রান্তিক-মতে সত্য দুই প্রকারের : সংবৃতি ও পরমার্থ অর্থাৎ (relative ও absolute)। কোনো ধর্ম বা বস্তুকে যখন পরিচ্ছিন্ন করা যায় তখন পরমার্থতঃ তার আর অস্তিত্ব থাকে না। তখন তার অস্তিত্ব আছে এ কথা বলা শুধু সংবৃতি সত্য মাত্র-(relative truth)। উদাহরণ-জল। যখন জলকে পরিচ্ছিন্ন করে তার রং স্বাদ শৈত্য প্রভৃতি ধর্মকে পৃথক করে বিচার করি তখন সে জলের কোনো সত্তা থাকে না। তখন শুধু ব্যাবহারিক হিসাবেই তার 'জল' আখ্যা দেই। জলের অস্তিত্ব একটা সংবৃতি সত্যমাত্র। তেমনি পঞ্চস্কন্ধাত্মক ধর্মেরও কোনো অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই, ধর্মও হচ্ছে শূন্য-স্বভাব। ধর্মশূন্যস্বভাব, কারণ তা ক্ষণিক। তার কোনো অতীত বা ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব বা বস্তুত্ব নেই, আছে শুধু ক্ষণিক স্থায়িত্ব। তার প্রধান কারণ এই যে, ধর্মের প্রকৃত স্বভাব প্রতি মুহূর্তেই বিনষ্ট হচ্ছে ও তার নূতন স্বভাবের উৎপত্তি হচ্ছে। এতে শুধু ধর্মের প্রবাহই সৃষ্টি হচ্ছে, সে প্রবাহের প্রত্যেক ধর্মই অনিত্য বা ক্ষণিক। এই সত্য প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন : কোনো সূত্রখন্ডের একধারে যদি অগ্নিসংযোগ ক'রে তাকে ঘুরানো যায় তাহলে যে অগ্নিময় বৃত্ত দেখা যায়, ধর্মপ্রবাহের লক্ষণও অনেকটা সেইরূপ। অগ্নিময় বৃত্ত বস্তুতঃ বহু ক্ষুদ্র জ্যোতিকণার সমষ্টিতে তৈরি। সে জ্যোতিকণাসমূহ এক বৃত্ত হিসাবে অনুমতি হলেও তাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোনো যোগসূত্র নেই। ধর্মপ্রবাহ বা ধর্মসন্তান তেমনি continuous phenomena মাত্র। সে ধর্মসন্তানের পিছনে কোনো সন্তানীন্ নেই, অর্থাৎ যেসমস্ত ধর্ম নিয়ে সন্তান বা প্রবাহ তৈরি হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনো বন্ধন নেই। উদাহরণ দিলেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। গতিশীল পিপীলিকার পংক্তিতে বহু পিপীলিকা চলেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যোগসূত্র নেই।

এই ধর্মসন্তানের যে বন্ধন বা ঐক্য তার পিছনে যে সন্তানীন্ আছে ব'লে আমরা মনে করি তা সম্পূর্ণ অলীক, মায়ামাত্র। আমাদের মনেন্দ্রিয় বা বিজ্ঞান, ধর্মসমূহের মধ্যে যে কার্যকারণ সম্বন্ধে স্থাপন করে তাতেই শুধু তাদের বন্ধনের অস্তিত্ব। সুতরাং এই ধর্মসমূহকে বলা যায় শুধু প্রতিবিশ্ব-প্রবাহ, যা প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয় (a series of images not directly perceptible)। এই-খানেও বৈভাষিকের সঙ্গে সৌত্রান্তিকের প্রভেদ। বৈভাষিকেরা ধর্মসমূহের প্রত্যক্ষী-করণে (direct percep-

tion) বিশ্বাস করেন।

সৌত্রান্তিকেরা বলেন যে, ধর্মসমূহের আর একটি লক্ষণ হচ্ছে অনিত্যতা। যে মুহূর্তে তাদের উৎপত্তি সেই মুহূর্তেই তাদের বিনাশ হয়। বৈভাষিকেরা ধর্মকে ক্ষণিক বলেন বটে, তবে ‘ক্ষণিকের’ অর্থ হচ্ছে ‘অল্পক্ষণ-স্থায়ী। প্রতিধর্মেরই তাঁদের মতে উৎপত্তি, স্থায়িত্ব, বৈনাশিক-অবস্থা ও বিনাশ আছে। ধর্মের উৎপত্তি ও বিনাশ সমকালীন নয়, পূর্বাপর।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৈভাষিকেরা ধর্মসমূহের অস্তিত্ব ও বস্তুত্বে বিশ্বাস করতেন, তাঁদের মনে ধর্মের প্রত্যক্ষীকরণ (direct perception) সম্ভবপর। আর সৌত্রান্তিকেরা ধর্মসমূহকে শূন্যস্বভাব বা অলীক মনে করতেন। তাঁদের মতে আমাদের বিজ্ঞান-প্রবাহেই শুধু ধর্মের অস্তিত্ব। সেধর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়, অনুমেয়-deductive। বৈভাষিকের নির্বাণ বাস্তব, অনাস্রব আনন্দময় অবস্থা, ভাবস্বভাব বা positive; আর সৌত্রান্তিকের নির্বাণ অবস্কুক, ও অভাব-স্বভাব বা unreal ও negative।

চতুর্থ অধ্যায়

মহাযান-নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন

এ কথা পূর্বেই বলেছি যে, বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলির তত্ত্বনির্দেশ করতে গিয়েই কালক্রমে নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এইসব সম্প্রদায়কে সাধারণতঃ দুটি গভীভূক্ত করা হয় : একটি হীনযান, অন্যটি মহাযান। এই আখ্যার উদ্ভব মহাযানের আচার্যদের হাতে। তাঁদের আদর্শ হল শুধু অর্হত্ত্ব অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মের বিনয় ব্যবহার মেনে ও জপতপ করে পূজনীয় হওয়া নয়, একেবারে বুদ্ধত্বলাভ করা। অনেকে এ দুরাশা পোষণ করতে সাহসী হন নি, কিন্তু মহাযানপন্থী আচার্যেরা এ আশাকে মোটেই দুরাশা মনে করেন নি। বুদ্ধত্বলাভই তাঁদের শুধু একমাত্র কাম্য নয়, সে বুদ্ধত্বলাভে দশের সহায় হওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আদর্শ, আর সে সহায় হতে গিয়ে যদি নিজেদের বুদ্ধত্বলাভে বিঘ্ন ঘটে তাতে কিছু যায় আসে না। এই জন্য এই আচার্যদের নিকট মৈত্রীই হল সবচেয়ে বড় চর্যা, আর তাই মৈত্রের এসে অধিকার করলেন গৌতমবুদ্ধের স্থান। তাঁদের আদর্শের গভী অনেক বেশি প্রশস্ত বলেই নিজেদের মতবাদের তাঁরা আখ্যা দিলেন মহাযান, আর যাঁদের আদর্শ অর্হত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে থেমে গেল তাঁদের মতবাদের আখ্যা দিলেন হীনযান।

হীনযান ও মহাযান এই দুয়ের ভিতর কোনটি বেশী প্রাচীন এ কথা বলা কঠিন। যেসব সম্প্রদায়কে হীনযান বলি তাদের শাস্ত্র মানলে বলতে হয় যে হীনযানই প্রাচীন, আর মহাযান শাস্ত্র মানলে স্বীকার করতে হয় যে বুদ্ধের বাণীর প্রথম থেকেই দুটো ধারা ছিল—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। যারা শ্রাবক, অর্থাৎ সাধনার চরম সোপানে উঠে পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করতে হলে যাদের বহু ব্রত আচরণ আবশ্যিক তাদের আদর্শ হল ব্যবহারিক জগতের, আর তা' অর্হত্ত্বের চেয়ে বড় নয়। আর যারা সাধনায় অগ্রগামী এবং পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি যাদের দুরাশা নয়, তাদের পথ হল পরমার্থের পথ, আর সে পথের শেষ নিশানা হচ্ছে বুদ্ধত্ব। এ কথা বিশ্বাস করলে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রথম থেকেই দুটো গভীর সৃষ্টি হয়েছিল, একটি শ্রাবকদের, অন্যটি ছিল যারা বেশি অগ্রসর তাদের। আর সব ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই যে প্রথম থেকে এ গভীর সৃষ্টি হয়ে থাকে তাতে সন্দেহ নেই।

সুতরাং হীনযান-মহাযানের কোনটি প্রাচীন তা বিচার করা সম্ভব নয়। হীনযানের দার্শনিক মতবাদ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, আর সে আলোচনায় এটা

স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে যে সে মতবাদ পরিপুষ্টিলাভ করেছিল খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের দিকে। মহাযানের যে দুটি প্রধান মতবাদ, মাধ্যমিক ও যোগাচার, তাও প্রায় ঐ সময়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মাধ্যমিকের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন নাগার্জুন। যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে মনে হয় যে তিনি ছিলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক। তাঁর বাস ছিল বিদর্ভ দেশে আর অন্ধ্রদেশের রাজা সাতবাহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। নাগার্জুনের রচিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ চীনা ও তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে, গ্রন্থের নাম হচ্ছে ‘সুহৃৎসেখ’। এই গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে নাগার্জুন তাঁর সুহৃৎ রাজা সাতবাহনকে সদুপদেশ দেবার জন্যই এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রাজা সাত-বাহনকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক মনে করা হয়। নাগার্জুন যেসব গ্রন্থে দার্শনিক মত প্রচার করেন সেগুলি হচ্ছে : মাধ্যমিকশাস্ত্র বিগ্রহব্যবর্তনী প্রজ্ঞাপারমিতা-শাস্ত্র ও মহাযানবিংশক। এর মধ্যে শেষ তিন খানি গ্রন্থের মূল পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে তাদের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ। ইউরোপীয় ও জাপানী পণ্ডিতদের চেষ্টায় সেসব অনুবাদ হতে নাগার্জুনের মতবাদ উদ্ধার করা হয়েছে। নাগার্জুনের পরে যেসব আচার্য মাধ্যমিকশাস্ত্র আলোচনা করেন তাঁদের মধ্যে আর্যদেব চন্দ্রকীর্তি ও শান্তিদেব প্রসিদ্ধ। আর্যদেব ছিলেন তৃতীয় শতকের আর শান্তিদেব সপ্তম শতকের লোক। চন্দ্রকীর্তি শান্তিদেবের পূর্ববর্তী। আর্যদেবের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে শতশাস্ত্র ও চতুঃশতক।

চীনা অনুবাদ থেকে শতশাস্ত্রের ও নেপালের এক খণ্ডিত পুঁথি ও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে চতুঃশতকেরও প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। শান্তিদেবের দুখানি গ্রন্থ, বোধিচর্যাবতার ও শিক্ষাসমুচ্চয় দুখানিরই মূল পাওয়া যায়। চন্দ্রকীর্তি যেসব গ্রন্থ রচনা করেন তার মধ্যে মধ্যমকাবতার ও প্রসঙ্গপদা প্রধান। প্রসঙ্গপদা হচ্ছে নাগার্জুনের মাধ্যমিকশাস্ত্রের টীকা, এই টীকা ও তৎসঙ্গে মাধ্যমিক শাস্ত্রের উদ্ধৃত অংশের মূল পাওয়া গিয়েছে। এইসব শাস্ত্রের আলোচনা করলেই মাধ্যমিক মতবাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

হাতিপূর্বে আমি বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক দর্শনের যে আলোচনা করেছি তাতে দেখিয়েছি যে বৈভাষিকেরা ধর্মের (phenomenon) অস্তিত্বে ও বস্তুত্বে বিশ্বাস করতেন, আর সৌত্রান্তিকেরা তাকে মনে করতেন শূন্যস্বভাব বা অলীক। তাঁদের মতে আমাদের বিজ্ঞানপ্রবাহেই ধর্মের অস্তিত্ব। আর সে ধর্মের জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়,

অনুমের। বৈভাষিকের মতে নির্বাণ বাস্তব অনাশ্রব আনন্দময় অবস্থা ও ভাব-স্বভাব, আর সৌত্রান্তিক মতে নির্বাণ অবস্কক ও অভাব-স্বভাব অর্থাৎ unreal ও negative। এ দুটির একটিকে বলা চলে ‘শাস্ত্রতবাদ’, অন্যটিকে ‘উচ্ছেদবাদ’।

মাধ্যমিক এ দুটি মতবাদের কোনোটিই গ্রহণ করল না, সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ করে দেখাল যে একটি মধ্যপথ অবলম্বন করা সম্ভব। সেই কারণেই তার আখ্যা হল মাধ্যমিক। ব্যবহারিক হিসাবে আমরা বৌদ্ধসূত্রগ্রন্থের ‘মধ্যমা প্রতিপদ’ের উল্লেখ পাই, এই ‘মধ্যমা প্রতিপদ’ের বিশেষ অর্থ হচ্ছে ভোগসুখ এবং কঠোর দৈহিক ক্রেশের কোনোটার ভিতর দিয়েই অর্হন্ত লাভ হয় না। মধ্যমা প্রতিপদ বা মধ্যপথ অবলম্বন করাই হচ্ছে বুদ্ধের অনুমোদিত পথ। সেইজন্য বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে বসে যখন কঠোর অনশনে তপশ্চর্যা করছিলেন তখন তিনি বোধিলাভ করেন নি, বোধিলাভ করলেন তখন যখন তিনি কঠোর অনশন পরিত্যাগ করে গোপকন্যার দেওয়া পায়স ভক্ষণ করলেন। এ মধ্যমা প্রতিপদ নাগার্জুনের ‘মাধ্যমিক’ না হলেও এ দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে দেখা চলে না।

নাগার্জুনের মতে পরমার্থসত্যের আলোচনা করতে গেলে অস্তি-নাস্তি, নিত্য-অনিত্য, আত্মা-অনাত্মা, প্রভৃতি অস্তিম বাক্যের কোনটিই সত্য নয়। পরমার্থ সত্যকে এ দুটির কোনটি দিয়েই ব্যাখ্যা করা চলে না, কারণ ‘অস্তি’ বললে বস্তুকে শাস্ত্রত স্বীকার করা হয় আর ‘নাস্তি’ বললে তাকে সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বুদ্ধবচনের সত্য অর্থ গ্রহণ করলে এর কোনোটিই স্বীকার করা চলে না ‘অস্তীতি শাস্ত্রতগ্রাহো নাস্তীত্যাচ্ছেদ-দর্শনম্।...শাস্ত্রতোচ্ছেদনির্মুক্তং তস্বং সৌগতসম্মতম্’।

নাগার্জুন তাঁর এই দার্শনিক মত স্থাপন করতে গিয়ে যে ন্যায়ের তর্ক অবলম্বন করলেন তা অতি সুস্পষ্ট, এত সুস্পষ্ট যে তা ইউরোপীয় পণ্ডিতদেরও চমক লাগিয়েছে। নাগার্জুনের দার্শনিক মতের মূলসূত্র হচ্ছে শূন্যতা। এই শূন্যতাকে কোনো প্রতিশব্দ দিয়ে বুঝানো কঠিন। তাই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ শব্দের অনুবাদ করেছেন নানাভাবে-Vacuity, Non-Substance, Universal Relativity।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকদের মতে ধর্মের (phenomenon) উৎপত্তির কারণ হচ্ছে প্রত্যয়, অর্থাৎ পূর্ববর্তী ধর্মকে কারণ স্বরূপে অবলম্বন করেই পরবর্তী ধর্মের উৎপত্তি হয়, আর তার উৎপত্তির সঙ্গেই পূর্ববর্তী ধর্মের বিনাশ হয়। কিন্তু এর উত্তরে নাগার্জুনের প্রথম কথা হল যে, ধর্ম অথবা ভাবের উৎপত্তি নেই, বিনাশও নেই-তার

কারণ যেসব ধর্ম বা ভাবকে কোনো পরবর্তী ধর্মের হেতুপ্রত্যয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় তার ভিতর সে ধর্মের স্বভাবের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়না। সেই জন্য পরভাব বা অন্য ধর্ম হতে কোনো ধর্মের উৎপত্তি সম্ভব নয়। আর বস্তুতঃ কোনো ধর্মের স্বভাব নেই বলেই অন্য ধর্মেরও স্বভাব থাকা সম্ভব নয়। ধর্মের এই উৎপত্তি নেই বলেই তার নাশও নাই। কিন্তু তাহলে কি ধর্মকে শাস্বত (eternal) বলা চলে? নাগার্জুন তার উত্তরে বলেন যে, ধর্ম যে অনিত্য, তার যে স্থিতি নাই এ কথা তো বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা, আর ধর্মের সে অনিত্যতা সম্বন্ধে কোনো সম্প্রদায়েরই সন্দেহ নাই। বীজ ও অঙ্কুরের উদাহরণ নিলে দেখা যায় যে, বীজ ও অঙ্কুরের কোনো সত্যকার উৎপত্তি নেই। তারা হচ্ছে পূর্ববর্তী অবস্থার পরিণতিমাত্র। তাদের কোনো সত্যকার বিনাশও নেই, কারণ তাদের তথাকথিত বিনাশের সঙ্গেই অন্য বীজাঙ্কুরের উদ্ভব হয়। আর সে বীজাঙ্কুরের কোনো স্থিতিশীলতাও নেই, কারণ তার অনন্ত পরিণতি চলছে, সে পরিণতিও প্রকৃত পরিণতি নয় কারণ তা একই গভীর মধ্যে নিবদ্ধ। তার একত্ব নেই, কারণ নিরন্তর বহু নূতন বীজাঙ্কুরের সৃষ্টি হচ্ছে; আর বহুত্বও নেই, কারণ মূলতঃ তারা একই জাতির ভিতর আবদ্ধ।

ধর্মসমূহের উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ বা বিনাশে বিশ্বাস করলে কালকেও (time) তিন ভাগে বিভক্ত করতে হয়। আর এ তিনটি ভাগ হচ্ছে-গত আগত ও গম্যমান (past, future ও present)। এই গতি বাদ দিলে কালের ধারণাকেও বাদ দিতে হয়। কিন্তু নাগার্জুনের মতে এ গতিও নেই। যে কাল গত হয়েছে (past) তার কোনো গতি নেই, আগত কাল অর্থাৎ যে কাল আসবে (future) তার গতির সম্বন্ধে কোনো কথা উঠতে পারে না। সুতরাং কথা উঠতে পারে গম্যমান বা (present) সম্বন্ধে। কিন্তু গত ও আগতের কথা বাদ দিলে গম্যমান কালের গতির কথাও ওঠে না, সুতরাং সে কাল হচ্ছে গতিহীন। সেই কারণেই কালের কোনো আরম্ভও নেই শেষও নেই, সে কালকে স্থির এবং গতিশীল কিছুই বলা চলেনা, কারণ গতির ধারণা না থাকলে গতিহীনের ধারণা করা অসম্ভব।

ন্যায়ের এই কূটতর্কে নাগার্জুন ষড়ায়তন ও পঞ্চঙ্কজ ধাতু প্রভৃতিরও অস্তিত্ব এবং বস্তুত্ব অপ্রমাণ করেছেন। হীনযানের মতে ষট্ ধাতুই হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল। এই ষট্‌ধাতু হচ্ছে চতুর্মহাভূত, আকাশ ও বিজ্ঞান। এই ষট্‌ধাতুর মধ্যে আকাশ ও নির্বাণ অসংস্কৃত অর্থাৎ অহৈতুকী ও আশ্রব-মুক্ত। অন্য ধাতুগুলি হচ্ছে সংস্কৃত। তারা আশ্রবমুক্ত নয়। নাগার্জুনের মতে ধাতুগুলির সম্বন্ধে অস্তি-নাস্তি বা সংস্কৃত-

অসংস্কৃত কিছুই বলা চলে না। বস্তুতঃ এগুলি আকাশের ন্যায় শূন্যগর্ভ, পরমার্থতঃ তারা শূন্যতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক মতে ধর্মকে তিনটি ক্ষণ বা মুহূর্ত অনুসারে ভাগ করা যায় : এ তিনটি ক্ষণ হচ্ছে যথাক্রমে উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ। এই উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ বা বিনাশই হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। কিন্তু নাগার্জুনের মতে এ লক্ষণগুলিও অলীক। কারণ এ তিন লক্ষণের পরিকল্পনা অখন্ড ভাবে না হয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সম্ভব। অখন্ডভাবে সে লক্ষণগুলির পরিকল্পনা হয় না; কারণ সেগুলি একই স্থানে বা একই কালে ঘটে না। পৃথক ভাবেও তাদের উপলব্ধি সম্ভব নয় কারণ পরস্পরকে অবলম্বন করে হচ্ছে তাদের সংঘটন। উদাহরণ স্বরূপে বিচার করা যাক আলোকের উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ আছে কি না। আলোকের উৎপাদ আছে, এ কথা প্রমাণযোগ্য নয়। কারণ অন্য বস্তুকে আলোকিত করবার পূর্বে আলোকের উৎপত্তি হয় একথা বলা যায় না। এমন কোনো মুহূর্তের পরিকল্পনা সম্ভব নয় যখন আলোক শুধু নিজেকেই আলোকিত করে। সুতরাং আলোকের উৎপত্তি আলোকিত বস্তুর উৎপত্তির পূর্বে হয়েছে এ কথা বলা চলে না। আলোকের উৎপত্তি অন্ধকারকে দূরীভূত করে, এ কথা বললে প্রশ্ন ওঠে যে সেই উৎপত্তির কোন্ মুহূর্তে সে অন্ধকারকে দূর করে। আলোকের উৎপত্তি ও অন্ধকারের বিনাশ এ দুটি ব্যাপার একই সময়ে ঘটে; একটির জন্য অন্যটি ঘটে, এ কথা বলা চলে না-তার কারণ এ দুটির কোনো সঙ্ক্ষিপ্ত পরিকল্পনা করা যায় না। সুতরাং আলোকের উৎপত্তি বলে কিছু নেই। তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা চলে যে কোনো বিশিষ্ট মুহূর্তে আলোক 'অস্তি'। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আলোকের এই 'অস্তি'-অবস্থার পূর্বে একটা ক্রমশঃ দৃশ্যমান অবস্থা ছিল কি না। নাগার্জুন বলেন যে, তাও অসম্ভব কারণ দৃশ্যমান হবার সঙ্গেই তার সম্পূর্ণ উদয় হয়ে যায়। কাল সম্বন্ধে বিচারে নাগার্জুন প্রমাণ করেছেন যে, গত ও আগত বলে কিছু নেই, আর সেই হিসাবেই আলোকেরও ভূত ভবিষ্যৎ বলে কোনো অবস্থা পরিকল্পনা করা যায় না। সুতরাং শুধু তার 'অস্তি' বা বর্তমান অবস্থা আছে-যাকে বলা যায় স্থিতি। আর এই স্থিতিকে বৌদ্ধধর্ম সর্বপ্রথমে অস্বীকার করেছে-বলেছে সমস্তই অনিত্য ও পরিণতিশীল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নাগার্জুনের মতে উৎপাদ ও স্থিতি বলে কিছু নেই। তাহলে ভঙ্গ বা বিনাশ আছে কি? নাগার্জুন বলেন যে সে বিনাশের পরিকল্পনাও অলীক। কারণ যার বিনাশ হয়ে গেছে তার বিনাশ সম্বন্ধে কোনো কথা ওঠে না। যার এখনও বিনাশ হয় নি তার বিনাশ সম্বন্ধেও কোনো কথা উঠতে পারে না। আর 'বিনাশ হচ্ছে' এরূপ কোনো অবস্থারও

কল্পনা সম্ভব নয়। ক্রমশঃ দৃশ্যমান বলে যেমন কোনো অবস্থা নাই, ক্রমশঃ বিনশ্যমান বলেও তেমনি কোনো অবস্থা নাই। পরমার্থতঃ কোনো বস্তুই বিনাশ সম্ভব নয়, কারণ তাহলে তার পরিণতির এমন-একটা অসম্ভব অবস্থা পরিকল্পনা করতে হয় যখন স্থিতি ও বিনাশ যুগপৎ ঘটে। সুতরাং নাগার্জুনের মতে ধর্মের উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ কিছুই নাই। হেতুপ্রত্যয় দিয়ে যে জগৎকে বুঝবার চেষ্টা করা হয় সে শুধু গন্ধর্বনগর বা স্বপ্নের জগৎ।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, হীনযান-মতে পুদ্গল বা আত্মা নেই বটে কিন্তু ধর্ম আছে, অর্থাৎ কারক নাই কিন্তু কর্ম আছে। বেদান্ত-মতে আত্মা বা কারক আছে কিন্তু কর্মজগৎ নেই। নাগার্জুনের মতে কারক কর্ম কিছুই নেই। এই মত স্থাপন করবার জন্য তিনি যে যুক্তি দিলেন তা অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হলেও তার উত্তর নেই। হীনযানের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে, যদি পুদ্গল বা কারকই না থাকে তাহলে একটা সত্যকার কর্মজগতের উদ্ভব হচ্ছে এ কথা বলার কোনো অর্থ নেই, অর্থাৎ গ্রাহকের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে গ্রাহ্যবস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করা সম্ভব নয়। বৈদান্তিক মতের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে, যদি কারকের সত্যকার অস্তিত্ব ধরা যায় তাহলে সে কারক অলীক কর্মজগতের সৃষ্টি করেছে, তা বলা চলে না। গ্রাহকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে গ্রাহ্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করা চলে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যদি কর্ম থাকে আর কারক না থাকে তাহলে সে কর্মের উৎপত্তি বোধগম্য হয় না, আর যদি কারক থাকে আর কর্ম না থাকে তাহলে উৎপত্তিও থাকে না। সুতরাং এ দুটি মতের প্রত্যেকটিই যুক্তিহীন। বস্তুতঃ কারক কর্ম কোনোটিরই অস্তিত্ব স্বীকার করা চলে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কারক কর্ম যদি কিছুই না থাকে তাহলে তাদের আভাস আসে কোথা থেকে। এর উত্তরে নাগার্জুন বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র প্রতীত্যসমুৎপাদের শরণাপন্ন হয়েছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদের হিসাবে এ আভাসের উৎপত্তি হয় প্রত্যয় (conditions) হতে। সুতরাং কারক ও কর্মের কোনো সত্যকার উৎপত্তি নাই, আছে শুধু আভাস; আর সে আভাসের অস্তিত্বও ব্যাবহারিক বা relative; পরমার্থতঃ এসবের প্রকৃত স্বভাব বলে কিছু নাই, আছে শুধু শূন্যতা।

কারক ও কর্ম যদি না থাকে তাহলে সংসার আছে কি না এ প্রশ্নও ওঠে। হীনযানের মতে সংসার আছে, কিন্তু তার প্রারম্ভ বা আদি নাই। হীনযানের সেই কথা ন্যায়ের বিচারে ফেলে নাগার্জুন বললেন যে, যদি সংসারের আদি না থাকে তাহলে সে সংসারের অন্তও নেই, আর আদি-অন্ত না থাকলে তার মধ্যের পরিকল্পনাও

সম্ভব নয়। সেই হিসাবে জন্ম জরা ও মৃত্যু কিছুই নেই। সুতরাং যে দুঃখ সেই সংসারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংবদ্ধ সে দুঃখেরও কোনো অস্তিত্ব স্বীকার চলে না। সেই হিসাবেই কর্মফল পাপ-পুণ্য শুচি-অশুচি রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ গ্রাহ্যগ্রাহক প্রভৃতি কিছুই অস্তিত্ব নেই, এ সমস্তই শূন্যগর্ভ।

এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রের কোনো অর্থ থাকে না, বুদ্ধবচন অলীক হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধ চারটি আর্যসত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন আর সেই সম্পর্কে বলেছেন যে সংসার দুঃখময়। সংসারের মূলে রয়েছে কর্ম ও কর্মফল, আর সে সংসার হতে মুক্তিলাভ করতে গেলে সদ্ধর্ম অবলম্বন করা আবশ্যিক। অথচ নাগার্জুনের মতে দুঃখ সংসার কর্ম কর্মফল—এ সব কিছুই নেই। তাহলে বুদ্ধবচন কি মিথ্যা? এর উত্তরে নাগার্জুন বলেন যে বুদ্ধ বচন মিথ্যা নয়। প্রথম হইতে তার দুইটি বিভিন্ন ধারা আছে : একটি হচ্ছে ব্যাবহারিক, অন্যটি পারমার্থিক। প্রথমটির আবশ্যক হচ্ছে লোক-ব্যবহারের জন্য, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধনমার্গে যারা অনুন্নত অর্থাৎ শ্রাবক তাদের চালিত করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা উন্নত সাধক, যারা গভীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায় তাদের জন্য। সুতরাং ব্যাবহারিক হিসাবে দেখলে দুঃখ সংসার কর্ম কর্মফল প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ এ সমস্তই শূন্য। স্বভাবশূন্যতাই হল একমাত্র সত্য, আর তা না বুঝলে জগতের প্রকৃত রহস্য ভেদ করা যায় না, নির্বাণ লাভ করাও সম্ভব হয় না।

কিন্তু সে নির্বাণ কি? যদি সমস্তই শূন্য হয়, যদি ধর্মসমূহের উৎপাদ স্থিতি ও ভঙ্গ না থাকে, যদি দুঃখ ও সংসার অলীক হয় তাহলে কিসের নিরোধ ও প্রহাণ হবে? অথচ দুঃখ ও ক্রেশের নিরোধ এবং প্রহাণেই নির্বাণ। এর উত্তরে নাগার্জুন বলেন যে নিরোধ প্রহাণ কিছুই নাই, আর নির্বাণের উৎপাদ নেই বিনাশও নেই। নির্বাণ ভাবস্বভাব নয়, কারণ ভাবের পরিণতি আছে। অথচ নির্বাণ অভাব-স্বভাবও নয় কারণ অভাবের কোনো অস্তিত্ব নাই। যখন ধর্মের উৎপাদ ভঙ্গ কিছুই হয় না, ধর্মসন্তানের সেই অপ্রবৃত্তিই হচ্ছে নির্বাণ। সেই উপশান্ত অবস্থা ভাব-স্বভাবও নয়, অভাবস্বভাবও নয়, অথচ তাকে নিরোধ বলা চলে না কারণ তার পর ধর্মের আর কোনো ক্রিয়া থাকে না—সে অবস্থা হচ্ছে supra-phenomenal; সুতরাং পরমার্থতঃ সংসার ও নির্বাণে কোনো প্রভেদ নাই! সংসারের অসংস্কৃত অবস্থা বা স্বভাবশূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। সুতরাং নির্বাণ = অসংস্কৃত সংসার = স্বভাবশূন্যতা।

পঞ্চম অধ্যায়

মহাযান-যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ

পূর্বেই বলেছি যে, মহাযানের আর-একটি প্রধান সম্প্রদায় হচ্ছে যোগাচার। এ মত পরিপুষ্ট লাভ করে চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর হাতে। অসঙ্গ এ সম্প্রদায়কে যোগাচার নামে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বসুবন্ধু নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানবাদ বা বিজ্ঞপ্তিমাাত্রবাদ। এ সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার বলা হয়, আর এর দার্শনিক মতবাদকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ। অসঙ্গ তাঁর গ্রন্থাবলীতে সাধনমার্গের কথাই বলেছেন বেশি; আর বসুবন্ধু আলোচনা করেছেন দার্শনিক মতবাদ।

যোগাচার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় খুব সম্ভব অসঙ্গের পূর্বে। অসঙ্গের দুখানি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে মহাযান সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র। প্রথম গ্রন্থখানির সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়; দ্বিতীয়খানির মূল লুপ্ত, কিন্তু চীনা অনুবাদ আছে। অসঙ্গের জীবনী সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তা হতে বোঝা যায় তিনি মৈত্রেয়ের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। এ মৈত্রেয় অনেকের মতে মৈত্রেয় বুদ্ধ, সুতরাং সে প্রবাদ হচ্ছে অলৌকিক। কিন্তু জাপানী পণ্ডিতদের মতে এ মৈত্রেয় হচ্ছেন মৈত্রেয়নাথ নামক একজন শাস্ত্রকার। এই মৈত্রেয়ের নামে প্রচলিত অভিসময়ালঙ্কার নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া মৈত্রেয়ের রচিত ‘মহাযান উত্তরতত্ত্ব’ ও ‘ধর্মতাবিভঙ্গ’ নামক দুখানি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়।

মহাযান সূত্রালঙ্কার হচ্ছে কতকগুলি সূত্র ও টীকা। এই সূত্র বা কারিকা-গুলিও অনেকের মতে মৈত্রেয়ের রচিত। এসব সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে মৈত্রেয়নাথের ঐতিহাসিকতা এখনো নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় নি। সুতরাং যোগাচারের প্রথম আচার্য অসঙ্গ এবং দ্বিতীয় আচার্য হচ্ছেন বসুবন্ধু, এই কথাই আমাদের মেনে নিতে হবে। অসঙ্গ বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়ের জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুরে, কিন্তু তাঁরা শাস্ত্র রচনা করেন অযোধ্যায়। বসুবন্ধুর প্রধান যোগাচার গ্রন্থ হচ্ছে বিংশক-কারিকা-প্রকরণ, ত্রিংশিকা-প্রকরণ এবং মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র। বসুবন্ধুর পরে এ সম্প্রদায়ে যেসব প্রধান আচার্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দিঙ্নাগ স্থিরমতি ও ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্মপাল ছিলেন নালন্দা-মহাবিহারের একজন প্রধান পণ্ডিত; তাঁর শিষ্য শীলভদ্রের নিকট প্রসিদ্ধ চীনা পণ্ডিত হিউয়েনসাং শিক্ষালাভ করেন। হিউয়েনসাংকেও যোগাচার

সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ তিনি চীনা ভাষায় বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি নামক এক বিপুল গ্রন্থ রচনা করেন, এ গ্রন্থে ভারতীয় আচার্যদের মতামত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে গ্রন্থ সম্প্রতি ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত রয়েছে এবং তা আলোচনা না করলে যোগাচার দর্শনের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকে।

যোগাচার সম্প্রদায়ের দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনকে অস্বীকার করে নিয়েছে। সেই কারণে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু উভয়েই স্বীকার করেছেন যে ধর্মসমূহ অলীক, তাদের উৎপাদ স্থিতি বিনাশ প্রভৃতিও অলীক, অর্থাৎ সমস্তই হচ্ছে শূন্যগর্ভ। কিন্তু পরমুহর্তেই তাঁরা বলেছেন যে, ধর্মসমূহ অলীক বটে কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বা চিন্তামাত্র—

বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমসদর্থাবভাসনাৎ।

যদ্বৎ তৈমিরিকস্যাসৎ-কেশোভ্রুকাদিদর্শনং।।

ন দেশকাল-নিয়মঃ সংতানানিয়মো ন চ।

ন চ কৃত্যক্রিয়া যুক্তা বিজ্ঞপ্তির্যদি নার্থতঃ।।

অর্থাৎ সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, তাদের সত্যকার অস্তিত্ব নেই-তৈমিরিক বা চক্ষুপীড়াগ্রন্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টি অলীক বস্তুসমূহের মত অবভাসমাত্র। ধর্ম যখন অলীক তখন দেশ এবং কালের পরিচ্ছেদ নেই, ক্ষণপ্রবাহও নেই, কৃত্যক্রিয়ার সমাধান বলেও কিছু নেই, কারণ ধর্মসমূহ প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানমাত্র। এই সম্পর্কে বসুবন্ধু যে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেছেন তা অতি প্রাচীন। বুদ্ধ বলেছেন—

চিন্তামাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকমিতি

অর্থাৎ হে জিনপুত্রগণ ত্রিধাতু বা সমস্ত জগৎ চিন্তামাত্র।

অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ধর্মসমূহের অলীকতার যে অর্থ নির্ধারণ করলেন তাতেই এই নূতন দার্শনিক মতের সৃষ্টি হল। আর এ দার্শনিক মত বৌদ্ধ সাধককে বেশি আকৃষ্ট করল। নাগার্জুনের শূন্যবাদ তার আধ্যাত্মদৃষ্টির পটভূমিকা হতে যে আনন্দময় কল্পলোককে অপসারিত করেছিল সে এক মুহূর্তেই তা ফিরিয়ে পেল।

মাধ্যমিক মত হতে বিজ্ঞানবাদের এই পরিণতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অসঙ্গের সূত্রালঙ্কারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সুতরাং সেই অধ্যায়ের আলোচনা করলেই এই দুই মতের সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা স্পষ্টভাবে ধরা যাবে।

অসঙ্গের মতে পারমার্থিক সত্য হচ্ছে অদ্বয় আর এই অদ্বয়ের লক্ষণ পাঁচটি—

ন সন্ন চাসন্ন তথা ন চান্যথা

ন জায়তে ব্যোতি ন চাবহীয়তে।

ন বর্ধতে নাপি বিশুদ্ধ্যতে পুন-

বিশুদ্ধ্যতে তৎপরমার্থলক্ষণং ॥

“পরমার্থ সৎ নয়, অসৎ নয় এবং অন্যরূপও কিছু নয়। তার উৎপত্তি এবং বিনাশ কিছুই নেই এবং তার ক্ষয়বৃদ্ধিও নেই। সে পরমার্থের বিশোধন হয় একথা বলা চলে না, কারণ প্রকৃতিক ক্লেশ তাকে স্পর্শ করে না, এবং তার বিশোধন হয় না এ কথাও বলা চলে না, কারণ আগন্তুক উপক্লেশের প্রভাব হতে তা মুক্ত নয়।”

পরমার্থের এই যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে তা মাধ্যমিকবাদ হতে কোনো হিসাবেই পৃথক নয়। এখানে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ উভয়েই একমতাবলম্বী। এর পর প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মদৃষ্টি কি। পঞ্চ-উপাদান ও পঞ্চস্কন্ধই বা কি। এ প্রশ্নের উত্তরে অসঙ্গ বলেছেন—

ন চাত্মদৃষ্টি স্বয়মাত্মলক্ষণা

ন চাপি দুঃসংস্থিততা বিলক্ষণা।

দ্বয়ান্ন চান্যদ্ ভ্রম এষ তদিত-

স্ততশ্চ মোক্ষা ভ্রমমাত্র-সংক্ষয় ॥

অর্থাৎ আত্মদৃষ্টির পিছনে কোন আত্মা নেই। দুঃসংস্থিততা বা পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের কোনো লক্ষণ নেই। অথচ এ দুটি ব্যতীত আর কিছুও নেই। সমস্তই ভ্রম মাত্র, মোক্ষ এই ভ্রমের সংক্ষয় ব্যতীত আর কিছু নয়। জন্ম এবং শমথা অর্থাৎ জন্মের নিবৃত্তির মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই, সংসার এবং নির্বাণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

অসঙ্গের এ মত নাগার্জুনের উক্তির পুনরাবৃত্তি। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে নাগার্জুনের নির্বাণ ও অসংস্কৃত সংসার অভিন্ন। সুতরাং এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায় সে কথাও অসঙ্গ বলেছেন—

অর্থাস বিজ্ঞায় চ জল্পমাত্রান্

সংতিষ্ঠতে তন্নিভচিত্তমাত্রে ॥

প্রত্যক্ষতামেতি চ ধর্মধাতু

স্তস্মাদ্বিযুক্তো দ্বয়লক্ষণেন ॥

অর্থাৎ মহাজনেরা যখন বুঝতে পারেন যে বস্তুর সত্যকার অস্তিত্ব নেই এবং তা গল্পমাত্র তখন তাঁরা চিত্তমাত্র বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। এই চিত্তমাত্রতাই হচ্ছে ধর্মধাতু অর্থাৎ ধর্মসমূহের আত্যন্তিক অবস্থা। এই ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হলেই দ্বয়জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়।

নাস্তীতি চিত্তংপরমেত্য বুধ্যা

চিত্তস্য নাস্তিত্বমুপৈতি তস্মাৎ।

দ্বয়স্য নাস্তিত্বমুপেত্য ধীমান্

সংতিষ্ঠতেহতদাতিধর্মধাতৌ ॥

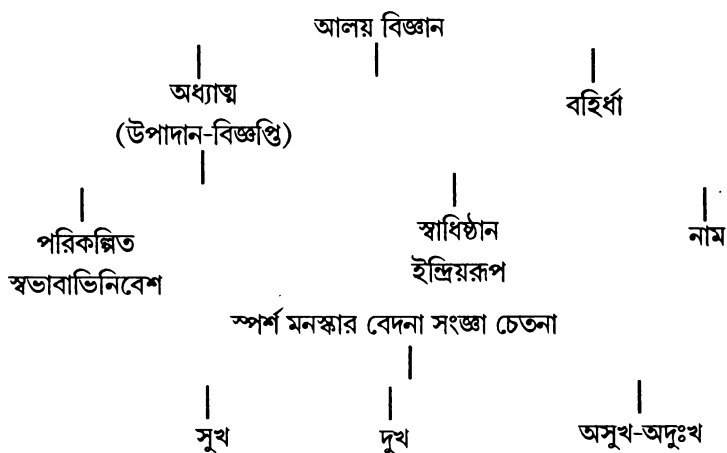
অর্থাৎ চিত্ত ব্যতীত সমস্তই অলীক বুঝতে পারলে এই চিত্তেরও যে অস্তিত্ব নেই তাও বুঝতে পারা যায়। বিকল্প জ্ঞান নষ্ট হলে ধর্মধাতুতে স্থিতি হয়।

অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গি সাধকের। তাই তিনি পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলেছেন তা শুধু দার্শনিক অলোচনা নয়, সাধকের সাধনমার্গের কথা। এই সাধনমার্গে চারটি স্তর হচ্ছে প্রধান। প্রথম স্তরে সাধক বুঝতে পারেন যে গ্রাহ্য গ্রাহক (subject and object) চিত্তমাত্র। দ্বিতীয় স্তরে তিনি উপলব্ধি করেন যে এই চিত্তমাত্রতা অদ্বয়; এ অবস্থায় সমস্ত বিকল্পজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তৃতীয় স্তরে সাধক বুঝতে পারেন যে এই চিত্তমাত্রতার কোনো অস্তিত্ব নেই, কারণ যেখানে গ্রাহ্যের (object) অস্তিত্ব নেই সেখানে গ্রাহকের (subject) অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। তা হলে পরমার্থ সত্য কি শূন্যমাত্র? তার উত্তরে অসঙ্গ বলেছেন যে তা শূন্যমাত্র নয়, কারণ চরম

অবস্থায় চিন্তামাত্রতা থাকছে না বটে কিন্তু ধর্মধাতু থাকছে। এই ধর্মধাতু কি তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি, ইউরোপীয় পন্ডিতেরা তার প্রতিশব্দ দিয়েছেন **idealistic world of phenomenon**।

সুতরাং যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানমাত্রতাই হচ্ছে পারমার্থিক সত্য। এই বিজ্ঞান হতে কি করে ধর্মসমূহের উদ্ভব হচ্ছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে বসুবন্ধুর ত্রিংশিকারিকায়। বসুবন্ধু বলেছেন যে, আত্মা ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই বিজ্ঞানের পরিণাম। আর এই পরিণাম তিন প্রকারের : ১. আলয়বিজ্ঞান, ২. আলম্বন, ৩. বিষয়বিজ্ঞপ্তি।

আলয় বিজ্ঞান সমস্ত ধর্মের বীজস্বরূপ। সমস্ত সাংক্ৰেশিক ধর্ম যা হতে জগতের উৎপত্তি, তার বীজ এখানে নিহিত থাকে বলে একে আলয় বলা হয় ‘সর্বসাং-ক্ৰেশিকধর্মবীজস্থানত্বাদ্ আলয়’। এই আলয়-বিজ্ঞানের পরিণতি দুরকমের : অধ্যাত্ম (subjective) এবং বহির্থা (objective)। অধ্যাত্মকে উপাদানবিজ্ঞপ্তিও বলা হয়, তার কারণ সমস্ত বস্তুর গ্রহণ করবার শক্তি এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানেই নিহিত। এ ছাড়া যা-কিছু সমস্তই বহির্থা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উপাদান-বিজ্ঞানের পরিণতি তিন প্রকারের : ১. ‘পরিকল্পিত-স্বভাবাভিনিবেশ-বাসনা’ অর্থাৎ যে বাসনাবীজ হতে জগতের পরিকল্পিত স্বভাব উদ্ভূত হয়, ২. ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়স্থান-যা হতে রূপাদির জ্ঞান উদ্ভূত হয়, এবং ৩. নাম অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা সংজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়। এই কারণে স্পর্শ মনস্কার বেদনা সংজ্ঞা ও চেতনা প্রভৃতি আলয়-বিজ্ঞানেরই পরিণতি। এই পাঁচটি হতেই সমস্ত ধর্মের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ত্রিকসংনিপাতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় এবং বিজ্ঞানের সংঘটনে স্পর্শের উৎপত্তি। সুতরাং স্পর্শ হচ্ছে ইন্দ্রিয়বিকার মাত্র। মনস্কার হচ্ছে ‘চেতস আভোগ’ বা বিষয়ের প্রতি চিন্তের অভিমুখী ক্রিয়া বেদনা হচ্ছে অনুভব তিন প্রকারের: সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ। সংজ্ঞা হচ্ছে, ‘বিষয়নিমিত্তোদগ্রহণং’ বা ‘নিরূপণং’; এবং চেতনা হচ্ছে, ‘মনসঃ চেষ্টা’।



আলয়-বিজ্ঞানের এই পরিণতি হতে যে ধর্মসমূহের উৎপত্তি হচ্ছে তাদের কোনো স্থায়িত্ব নাই। বসুবন্ধু তাদের নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন ('স্রোতসৌঘবৎ')। এ প্রবাহ হচ্ছে হেতুফল বা কার্যকারণের নিরন্তর প্রবাহ। জলপ্রবাহ হতে যেমন জলের পূর্বাপর ভাগবিচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, এ প্রবাহেও তা সম্ভব নয়। জলপ্রবাহ যেমন পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকা তৃণ কাষ্ঠ দ্রব্য প্রভৃতি নিয়ে প্রবাহিত হয় আলয়-বিজ্ঞানের এই প্রবাহ তেমনি স্পর্শ মনস্কার প্রভৃতি শক্তির দ্বারা পুণ্য অপুণ্য প্রভৃতি বাসনা সংগ্রহ করে নিরন্তর ভাবে প্রবাহিত হয় এবং সংসারের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহের ব্যাবৃ্ত্তিই হচ্ছে অর্হন্ত।

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে আলম্বন, সে কথা পূর্বেই বলেছি। এই আলম্বনের ব্যাখ্যাও বসুবন্ধুর ত্রিংশিকা-কারিকায় পাওয়া যায়-

তদাশ্রিত্য প্রবর্ততে।

তদালম্বং মনোনাম বিজ্ঞানং মননাত্মকম্॥

অর্থাৎ আলম্বন আলয়-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়। এই আলম্বন হচ্ছে মননাত্মক। সুতরাং এই আলম্বনকে মনোবিজ্ঞান বলা চলে। এই আলম্বনের পরিণতিতেই চার প্রকার ক্রেশের উৎপত্তি। এই চার প্রকার ক্রেশ হচ্ছে: আত্মদৃষ্টি আত্মমোহ আত্মমান এবং আত্মস্নেহ।

বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি হচ্ছে, বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় হচ্ছে ষড়বিধ: রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শগীয়া এবং ধর্মাত্মক। এই বিষয় বিজ্ঞপ্তির পরিণতিতেই যে ধর্মসমূহের উদ্ভব হয় তার পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। এ ধর্ম হচ্ছে সৌত্রান্তিকদের ছয় প্রকারের চৈতন্যধর্ম : ১. চিন্তামহাভূমিক, ২. কুশল, ৩. ক্লেশ, ৪. অকুশল, ৫. উপক্লেশ, ৬. অনিয়তভূমিক।

সুতরাং বসুবন্ধুর মতে ‘সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্’ অর্থাৎ সমস্তই বিজ্ঞপ্তি মাত্র। বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব। আর এই কারণে সে ত্রিজগৎ যে অলীক তাতে আর সন্দেহ কি?

তাহলে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মতে নির্বাণ কি? নির্বাণ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় অবস্থিতি। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় যতক্ষণ অবস্থিতি না হয় ততক্ষণ গ্রাহ্যগ্রাহক থাকে, ধর্মসমূহেরও সৃষ্টি চলে। এই কথা সুস্পষ্ট করবার জন্য বসুবন্ধু বলেছেন-

যাবদবিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বে বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতি।

গ্রাহদ্বয়সানুশয়স্তাবন্ন বিনিবর্ততে ॥

অর্থাৎ যতক্ষণ বিজ্ঞান চিন্তামাত্রত্বে বা চিন্তাধর্মতায় অবস্থান না করে ততক্ষণ গ্রাহদ্বয়ের ক্রিয়ার নিবৃতি হয় না। গ্রাহ্য এবং গ্রাহক অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি এবং গ্রহণ করার ব্যাপারই হচ্ছে গ্রাহদ্বয়। এই গ্রাহদ্বয়ের উৎপত্তি হয় আলয়-বিজ্ঞানে যে বীজ নিহিত থাকে সেই বীজ হতে। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অদ্বয় লক্ষণ-বিশিষ্ট, সুতরাং যোগীর চিন্তা যখন সেই অদ্বয় চিন্তামাত্রতায় নিবিষ্ট হয় তখনই আলয়-বিজ্ঞানে নিহিত গ্রাহদ্বয়ের বীজ বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় যোগীর চিন্তের কি অবস্থা হয় তা বসুবন্ধু ত্রিংশিকাকারিকার শেষ দুটি শ্লোকে সংক্ষেপে বলেছেন-

অচিন্তো নুপলভ্তোহসৌ জ্ঞানং লোকন্তরং চ তৎ।

আশ্রয়স্য পরাবৃন্তির্ দ্বিধা দৌষ্টল্যহানিতঃ ॥

স এবানাশ্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।

সুখো বিমুক্তিকাযোহসৌ ধর্মাখ্যোহয়ং মহামুনেঃ ॥

অর্থাৎ তখন লোকান্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন চিন্তা থাকে না, উপলব্ধি বা গ্রাহ্য-

গ্রাহক সম্বন্ধে বিজ্ঞান থাকেনা, দুই প্রকারের দৌষ্ঠ্য-বিনষ্ট হওয়ায় আশ্রয়ের পরাবৃত্তি ঘটে। সে লোক হচ্ছে অনাস্রব, অচিন্ত্য, কুশল, ধ্রুব বা অচল, সুখময় এবং বিমুক্তিবিশিষ্ট। এই অবস্থাকে বলা হয় বুদ্ধের ধর্মকায়।

দৌষ্ঠ্য দুই প্রকারের: ক্রেশাবরণীয়, এবং জ্যেবাবরণীয়। দৌষ্ঠ্য হচ্ছে আশ্রয়ের অকর্মণ্যতা। বসুবন্ধু আশ্রয়ের যে অর্থ নির্দেশ করেছেন তা হতে বোঝা যায় যে, আশ্রয় হচ্ছে ধর্মসমূহের বীজস্বরূপ আলয়বিজ্ঞান ('সর্ববীজকমালয়-বিজ্ঞানম্')। সুতরাং আলয়-বিজ্ঞানে নিহিত বীজের উৎপাদনশক্তিকেই দৌষ্ঠ্য বলা চলে। বিজ্ঞপ্তি চিত্রমাত্রতায় নিবদ্ধ হলে এই আশ্রয়ের পরাবৃত্তি ঘটে।

পরাবৃত্তি যোগাচারের একটি পরিভাষিক শব্দ। সুতরাং এই পরাবৃত্তি কি তা বুঝতে পারলে নির্বাণের অবস্থা স্পষ্ট হবে। অসঙ্গ তাঁর সূত্রাংকারের নবম অধ্যায়ে এই পরাবৃত্তি অবস্থার বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয় মন বিকল্প মৈথুন প্রভৃতির পরাবৃত্তিতে পরম বিভূত্ব লাভ হয়। এই পরাবৃত্তি অবস্থাই হচ্ছে স্থায়ী নির্বাণের অবস্থা। পরাবৃত্তির সাধারণ অর্থ হচ্ছে, বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে স্বস্থানে ফিরে আসা। যোগশাস্ত্রে এ কথার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। চিন্তের দুটি সহজ শক্তি আছে: একটি বহিমুখী বা অনুলোম, অন্যটি, অন্তর্মুখী বা প্রতিলোম। প্রতিলোমগতি অবলম্বন করে নিজের কারণ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রতিলোম-গতি সম্পূর্ণ হওয়া এবং পরাবৃত্ত হওয়া একই কথা। এই গতি সম্পূর্ণ হলে সাধকের সমস্ত বৃত্তি অন্তর্মুখী হয়। এই পরাবর্তনকে *retroversion* বা *transformation* বলা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বজ্রযান ও সহজযান

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকেও উত্তর ভারতে মাধ্যমিক ও যোগাচার মত প্রবল ছিল। ঐ শতকের মধ্যভাগে হিউয়ান সাং যখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্রের নিকট যোগাচার-দর্শন অধ্যয়ন করছিলেন তখনও সেখানে তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু অষ্টম শতক হতেই নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি বিদ্যায়তনের আচার্যদের হাতে যে বৌদ্ধদর্শন পরিপুষ্টি লাভ করে অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত প্রাচ্য ভারত ও তিব্বতকে আচ্ছন্ন করে তুলল, সে বৌদ্ধমত অভিনব।

এই অভিনব বৌদ্ধমতের সাধারণ আখ্যা দেওয়া চলে তন্ত্রযান। তন্ত্র কথার প্রকৃত অর্থ কি তা জানলেও এ কথা স্বীকার করা চলে যে তার মধ্যে এমন-সব সাধনপদ্ধতি নির্দেশ করা হয়েছে যা সাধারণের বোধগম্য নয়। সেই পদ্ধতিতে সিদ্ধপুরুষদের উপদেশ অনুসরণ করে যারা সেই পথ অবলম্বন করে ধর্মযাজন করেন তাঁরাই তার অর্থ জানেন। তন্ত্রযান বৌদ্ধমতও তাই। তার মধ্যে সাধন-বিষয়ের যেসব ইঙ্গিত আছে তা সুবোধ্য নয় এবং যে পরিভাষার সঙ্গে সে ইঙ্গিত জড়িত রয়েছে তার ব্যাবহারিক অর্থ গ্রহণ করলে কদর্থ উপনীত হতে হয়।

তন্ত্রযানের মধ্যে অন্তত তিনটি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। এ তিনটি হচ্ছে কালচক্রযান, বজ্রযান ও সহজযান। প্রত্যেক মতেরই গ্রন্থ ছিল, এবং সে গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণভাবে তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। কতকগুলি গ্রন্থের সংস্কৃত মূল নেপালে পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেষ্টায় যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, দোহাকোষ, অদ্বয়-বজ্রসংগ্রহ, গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের ভাষা প্রাচীন বাংলা। দোহাকোষের ভাষা অপভ্রংশ। এগুলি মৌলিক গ্রন্থ কিন্তু অন্যান্যগুলি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। মৌলিক গ্রন্থগুলির মধ্যে বেশির ভাগ এখনো উদ্ধার করা বা প্রকাশ করা হয় নি। শুধু পুঁথিপত্রের সাহায্যে এসব মতের কিছু পরিচয় দেওয়া সম্ভব।

কালচক্রযানের একখানি পুঁথি নেপাল হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ পুঁথির নাম হচ্ছে লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা। এর অন্য নাম হচ্ছে বিমলপ্রভা। এ টীকার রচয়িতা

ছিলেন সুচন্দ্র। কালচক্রযানের আর-একজন প্রচারক ছিলেন অভয়াকরগুপ্ত। অভয়াকরগুপ্ত খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের লোক, খুব সম্ভব বাঙালী এবং পাল-বংশীয় রাজা রামপালের সমসাময়িক। অভয়াকরগুপ্তের রচিত অনেক গ্রন্থের পুঁথি এখনো পাওয়া যায়। তাঁর রচিত একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বুদ্ধকপালতন্ত্রটীকা।

বিমলপ্রভায় কালচক্রের যে বর্ণনা রয়েছে তাতে কালচক্র সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে-

নমঃ শ্রীকালচক্রায় শূন্যতাকবুণাত্মনে।

ত্রিভবোৎপত্তিস্ক্রিয়াভাব জ্ঞানজ্ঞেয়ৈকমূর্তয়ে।।

সাকারা চ নিরাকৃতিভগবতী প্রজ্ঞাতয়ানিস্তিত।

উৎপাদব্যয়বর্জিতোহক্ষরসুখো হাস্যাদিসৌখ্যোজ্জ্বিতঃ।

বুদ্ধানাং জনকস্তিকায়সহিতঃ ত্রৈকল্যসংবেদকঃ।

সর্বজ্ঞঃ পরমাদিবুদ্ধঃ ভগবান্ বন্দে তমেবাদ্বয়ম্।।

অর্থাৎ কালচক্র হচ্ছেন শূন্যতা এবং করুণা উভয় হতে অভিন্ন। তাঁর মধ্যে ত্রিজগতের উৎপত্তি ও ক্ষয় কিছুই নেই। জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়েই সেখানে মিলিত হয়েছে। সাকার ও নিরাকার উভয় ভাবসম্পন্ন ভগবতী প্রজ্ঞা শক্তিরূপে কালচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত। কালচক্র সৌখ্যসম্পন্ন, আর তাঁর এই সুখভাবের উৎপত্তি এবং ক্ষয় কিছুই নাই। ত্রিকাল ও ত্রিকায় তাঁরই মধ্যে নিহিত এবং তিনি সমস্ত বুদ্ধের জনকস্বরূপ। তিনি নিজে সর্বজ্ঞ এবং আদিবুদ্ধ।

এ কথা আরও স্পষ্ট করে না বললে কালচক্রের অর্থ বোঝা যাবে না। মাধ্যমিক মতের আলোচনায় শূন্যতা শব্দের উল্লেখ পেয়েছি। নাগার্জুন বলেছেন যে শূন্যতা কি তা অপরকে বোঝানো যায় না, তা নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয়। তার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে শূন্যতা ‘প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্’, অর্থাৎ প্রপঞ্চ বা মায়ার দ্বারা তা কলুষিত হয় না। সেই কারণে শূন্যতা নির্বিকল্প জ্ঞান, এবং তা শান্ত, উৎপত্তিবিনাশহীন এবং ‘অনানার্থ’ অর্থাৎ তার নানা অর্থ হয় না।

‘ত্রিকাল ও ত্রিকায়’ কালচক্রের মধ্যে নিহিত বলা হয়েছে। ত্রিকাল হচ্ছে গত আগত ও গম্যমান (past, future এবং present)। কালের এই ভেদজ্ঞান লোপ পৈলে চরম জ্ঞান লাভ হয়। কালচক্রের মধ্যে সেই জ্ঞান নিহিত। ত্রিকায় হচ্ছে বুদ্ধের বিভিন্ন প্রকৃতি। মহাযানপন্থীরা ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাস করতেন না। তাঁদের মতে সত্য দুই প্রকারের : পারমার্থিক এবং সাংবৃত্তিক বা ব্যাবহারিক। সুতরাং বুদ্ধও দুই প্রকারের, পারমার্থিক বুদ্ধ, যাকে তাঁরা বলেছেন ধর্মকায় বুদ্ধ। সাংবৃত্তিক জগতের বুদ্ধ দূরকমের : নির্মাণকায় এবং সন্তোষকায়। যখন তিনি সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষার জন্য সূত্র অবদান প্রভৃতি ব্যস্ত করেন তখন তিনি নির্মাণকায় বুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই নন। বোধিসত্ত্বদের নিকট যখন তিনি গুঢ় ধর্মার্থ ব্যস্ত করেন তখন তিনি সন্তোষকায় বিচরণ করেন এবং যখন পারমার্থিক সত্য অবলম্বন করেন তখন তিনি ধর্মকায় অবস্থান করেন। ধর্মকায় এক। নির্মাণকায় ও সন্তোষকায় বহু। কালচক্রে যখন কায়ের বিভিন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান তিরহিত হয় তখন যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা ধর্মকায়াত্মক মনে করা যেতে পারে।

এ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা হতে অনুমান করা যেতে পারে যে কালচক্র ব্রহ্মস্বরূপ। কিন্তু কালচক্র ঠিক তা নয়, কারণ পরমুহূর্তেই কালচক্র করুণাত্মক, প্রজ্ঞারূপ শক্তিসংযুক্ত এবং সমস্ত বুদ্ধের জনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। করুণা শব্দের অর্থ অস্পষ্ট না হলেও তা মহাযানে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বুদ্ধ কিরূপে উৎপন্ন হন তা বোঝাতে গিয়ে শাস্ত্রিদেব তাঁর শিক্ষাসমুচ্চয়ে বলেছেন যে, বোধিচিন্তা হচ্ছে শুক্র, করুণা অব্রুদ, মৈত্রী পেশী এবং আশয় হচ্ছে ঘন। অর্থাৎ বোধিচিন্তা বুদ্ধসৃষ্টির বীজমাত্র, তা করুণাভাবসম্পন্ন হলেই সে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সুতরাং কালচক্রে বোধিচিন্তা করুণাভাবসম্পন্ন; সৃষ্টির ক্ষেত্র হচ্ছে প্রজ্ঞা। তাই লোককল্পনায় কালচক্র হচ্ছেন আদিবুদ্ধ, প্রজ্ঞা হচ্ছেন ভগবতী। উভয়ের সম্মিলিত হয়ে লোকহিত কল্পে অসংখ্য বুদ্ধ সৃষ্টি করেন; সেসব বুদ্ধ হচ্ছেন সন্তোষকায় ও নির্মাণকায়।

কালচক্র-সম্প্রদায়ের যেসমস্ত পুঁথি পাওয়া যায় তাতে দার্শনিক আলোচনার চেয়ে সাধন বিষয়ের কথাই বেশি। এই সাধন বিষয়ে দিন তিথি নক্ষত্র যোগ প্রভৃতির বিচার একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। অভয়াবরগুপ্ত কালচক্রাবতার নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে ‘বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্র-সংক্রান্তি’ প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। উপরন্তু গ্রন্থরচনাকালএমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে যা হতে এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না যে,

কালচক্রপন্থী সাধক গ্রহনক্ষত্রের গতি অনুসারে জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের মতে সে গতি অতিক্রম করে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। এই কারণেই হয়তো এ সম্প্রদায়কে কালচক্রযান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

কালচক্রযান প্রাচীন বৌদ্ধধারা কতটা অক্ষুণ্ণ রেখেছিল তা বলা কঠিন। মাধ্যমিক দর্শনের ধারা যে সে সম্প্রদায় অনেক পরিমাণে অনুসরণ করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উপরন্তু এ কথা মনে করা হয়ত অসংগত নয় যে প্রাচীন ‘ধর্মচক্রের সঙ্গে কালচক্রের একটা গূঢ় সম্বন্ধ ছিল। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করবার পর বারাণসীতে প্রথম ধর্ম প্রচার করলেন, প্রাচীন সূত্রকারেরা এই ধর্মপ্রচারকার্যকে বলেছেন-ধর্মচক্র-প্রবর্তন। সে ধর্মচক্র দ্বাদশ-অর-বিশিষ্ট। এই দ্বাদশটি অর কি, সে সম্বন্ধে সূত্রকারেরা নীরব। সূর্য যে দ্বাদশটি রাশির সঙ্গে বিশ্ব-পরিক্রমণ করেন তা প্রাচীন জ্যোতিষীরা জানতেন। সূর্যের এই পরিক্রমণ কালচক্র ব্যতীত আর কি হতে পারে?

বজ্রযানে দৃষ্টিভঙ্গি যে পৃথক এ কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। নেপালের বর্তমান বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ বজ্রযান। এ ধর্মে একটি বিরাট পূজা-পদ্ধতিকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দেবদেবীর সংখ্যাও অনেক। এই পূজাপদ্ধতি বাদ দিলে বজ্রযান মূলতঃ অন্যান্য যান হতে পৃথক নয়। বজ্রযানের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ জ্ঞানসিদ্ধিতে বলা হয়েছে, ‘বোধিচিন্তং ভবেৎ বজ্রং’ অর্থাৎ বোধিচিন্তই হচ্ছে বজ্র। বোধিচিন্ত কি তার ইঙ্গিত পূর্বেই পেয়েছি। লৌকিক অর্থে বোধিচিন্ত হচ্ছে শুক্র, এবং পারমার্থিক অর্থে চিন্তের সেই অবস্থা যা হতে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। কঠোর সাধনার দ্বারা যখন বোধিচিন্ত স্থিরস্বভাব প্রাপ্ত হয় তখন তা বজ্রের মত কঠিন, অভেদ্য ও অবিচলিত হয়। সেই কারণে যেসব মহাপুরুষেরা বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন তাঁদের বজ্রধর বা বজ্রসমু আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। যে আসনে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেন তাকে বজ্রাসন বলা হয়। এ ধারণা যে খুব প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নীচে যে আসনে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা অতি প্রাচীনকালেই বজ্রাসন আখ্যা পেয়েছিল।

বোধিচিন্ত বজ্রস্বভাবসম্পন্ন হলে সাধনার ক্ষেত্রে সাধক বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সেই জন্যই জ্ঞানসিদ্ধি গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে-

সর্বতাথাগতং জ্ঞানং বজ্রযানমিতি স্মৃতং।

তথাগত বা বুদ্ধেরা যে জ্ঞানলাভ করেন তাকে বলা হয় তথাগত জ্ঞান। পারমার্থিক সত্য হচ্ছে ‘তথতা’, কারণ সে সত্যকে লৌকিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যারা সে সত্য উপলব্ধি করেন তাঁরা হয় উপনিষদের ঋষিদের মত ‘নেতি নেতি’ করে, নাইয় বৌদ্ধদের মত ‘তথা’ বা ‘সেই রকম’ বলে সে সত্যের আভাস দিতে পারেন। সেই সত্য নিয়ে বুদ্ধেরা জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁরা ‘তথাগত’। সুতরাং বজ্রযানের শেষ প্রতিপাদ্য বিষয় যদি সেই জ্ঞানই হয় তাহলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তার মূলতঃ কোনো প্রভেদ নেই। সে সত্য উপলব্ধি করার জন্য বজ্রযানপন্থীরা নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন মাত্র।

এই নূতন সাধনপদ্ধতি ছিল তাঁদের মতে অত্যন্ত গুহ্য। সেই কারণে কোনো গ্রন্থেই স্পষ্ট করে সরল ভাষায় তার ব্যাখ্যা হয়নি। এ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে যে পরিভাষার ব্যবহার করা হয়েছে তা উদ্ভাস স্মার্ত বর্তমানে অসম্ভব না হলেও অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যতটা বুঝতে পারা যায় তা হতে মনে হয় যে, এই নূতন সাধনপদ্ধতিতে ‘মন্ত্র মুদ্রা ও মন্ডল’ প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত না করতে পারলে যে চরম সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না তাতে কোনো তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের সাধকেরই সন্দেহ ছিল না। সেই কারণে বজ্রযানী বৌদ্ধসাধকও প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিকে বিকশিত করে ও তা আয়ত্তাধীন করে চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতেন। এই কার্যের জন্যই তাঁদের মন্ত্র মুদ্রা ও মন্ডলের প্রয়োজন হত।

মন্ত্র শব্দবীজ, সুতরাং সেই মন্ত্রকে অবলম্বন করে প্রাকৃতিক শক্তিকে উদ্ভুদ্ধ করা ও আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। এই শব্দবীজ যখন সাধকের নিকট মূর্তিপরিগ্রহ করে উপস্থিত হয় তখনই নানা দেবদেবীর সৃষ্টি হয়। শক্তির বিকাশ অসংখ্যভাবে হতে পারে, তাই দেবদেবীও অসংখ্য। এইসমস্ত দেবদেবীরা যখন আবির্ভূত হন তখন তাঁরা তাঁদের গুণানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। এইসমস্ত স্থানের সমাবেশে মন্ডলের সৃষ্টি। এই মন্ডলের কেন্দ্রে উপবেশন করেন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর তাঁর চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বহু দেবদেবী আসন গ্রহণ করেন। মন্ত্র যখন এই ভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে তখন দেবতাদের আবাহন হয় মুদ্রায়। মুদ্রা করন্যাস মাত্র, কিন্তু তা নির্বাক সাধকের ভাষাও বটে। সেই কারণে বজ্রযানে মুদ্রাও বহু প্রকারের।

সকল সাধকের জন্য এক মন্ত্র কার্যকরী নয়। সাধকের গুণানুযায়ী মন্ত্রের প্রয়োজন। এই কারণে সাধকের কুল নির্ণয়ের আবশ্যিক। হেবজ্রতন্ত্রে এই কুলের বিশদ বর্ণনা

দেওয়া হয়েছে—

কুলানাং পঞ্চভূতানাং পঞ্চস্কন্ধস্বরূপিণাং ।

কুল্যতে গম্যতেহেনেনেতি কুলমিত্যভিধীয়তে ।

প্রাচীন বৌদ্ধমতে পঞ্চস্কন্ধই হচ্ছে সংসারের বীজস্বরূপ । এই পঞ্চস্কন্ধ যতক্ষণ নষ্ট না হয় ততক্ষণ পুনর্জন্ম সংসার ও দুঃখকষ্ট । পঞ্চস্কন্ধ ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বোমের সূক্ষ্মাবস্থা । এই পঞ্চস্কন্ধাত্মক শক্তিই হচ্ছে কুল, আর সেই কুলকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলেই সাধক তাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হন । সুতরাং তাঁর অন্তর্নিহিত কমবীজের দ্বারাই কুলের স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় ।

পঞ্চকুলের নাম বজ্জ পদ্ম কর্ম তথাগত ও রত্ন । এই পঞ্চকুলের অন্য নামও আছে—

বজ্জ = ডোম্বি

পদ্ম = নটী

কর্ম = রজকী

তথাগত = ব্রহ্মাণী

রত্ন = চন্ডালী

এই পঞ্চকুল পরিণতি লাভ করে পঞ্চবুদ্ধ-শক্তিতে পর্যবসিত হয় । এই পঞ্চবুদ্ধ বা তথাগতের নাম যথাক্রমে বৈরোচন অশ্কাভ্য রত্নসম্ভব অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি । যিনি সামর্থ্যানুযায়ী দীক্ষা পেয়ে সাধনায় অগ্রসর হন এবং এই কুল লাভ করেন তাঁকে কুলীন বলা হয় । সুতরাং বজ্জযানে এই কুলীন ব্যতীত অন্য কেউ পরমার্থ লাভ করতে পারেন না ।

সহজযান বজ্জযানেরই শেষ ভাগ । কারণ উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট যোগ রয়েছে । সহজযানের প্রাচীন শাস্ত্র বেশির ভাগ তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত আছে । কয়েক খানি মূল গ্রন্থ নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে ও প্রকাশিতও হয়েছে । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রাচীন বৌদ্ধ গানগুলি চর্যাপদ নামে প্রকাশ করেছিলেন সেগুলি বৌদ্ধ সহজপন্থীদের গান । এই সব গানের রচয়িতা আর্যদেব ভুসুকু কাহু সরহ লুই

প্রভৃতি আচার্যগণ তিব্বতী সাহিত্যে সিদ্ধাচার্য নামে উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং এ কথা অনুমান করা অসংগত হবে না যে এই সিদ্ধাচার্যদের হাতেই সহজযান গড়ে উঠেছিল।

চর্যাপদগুলি খৃস্টীয় দশম-একাদশ শতকের বাংলা ভাষায় রচিত। তার মধ্যে সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে তা এমন-একটি পরিভাষার মধ্যে আবদ্ধ যা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে সে সাধনপদ্ধতি যে সহজযানের তাতে সন্দেহ নাই। কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করে দিলেই একথা বোঝা যাবে—

১. কাহু বিলসঅ আসবমাতা।

সহজ নলিনীবন পইসি নিবিতা ॥ (৯।৪)

= কাহু সহজরূপ পদ্মবনে প্রবেশ করে মধুপানে মত্ত হয়ে এক মনে বিলাস করছেন।

২. ভুসুকু ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ।

সহজানন্দ মহাসুখ লীলেঁ ॥ (২৭।১০)

= ভুসুকু বলছেন, আমি সহজানন্দরূপ লীলা দ্বারা মিলন কাকে বলে বুঝতে পেরেছি।

৩. ঘুমই ন চেবই সপরবিভাগা।

সহজ নিদালু কাহিলা লাঙ্গা ॥

চেঅণ ন বেঅন ভর নিদ গেলা।

সঅল মুকল করি সুহে সুতেলা ॥ (৪২।৪)

= কাহু সহজ নিদ্রায় অভিভূত, তিনি আত্মপর-বিভাগ চিন্তা করছেন না। তাঁর চেতনা বেদনা কিছুই নেই। তিনি সমস্ত হতে মুক্ত হয়ে নির্ভয়ে ঘুমিয়েছেন।

৪. অদভুঅ ভবমোহ রে দিসই পর অঙ্গণা।

এ জগা জলবিন্ধাকারে সহজে সুণ অপণা ॥ (৩৯।৬)

= ভবমোহ অদ্ভুত, এর দ্বারা আত্মপর সমস্ত দেখা যায়। কিন্তু জগৎ জলবিন্ধাকার, আত্মা শূন্য, সহজের দ্বারা বোঝা যায়।

৫. চীঅ থির করি ধরহরে নাই।

আন উপায়ে পার ণ জাই ॥

নৌবাহী নৌকা টাণঅ গুণে

মেলি মেলি সহজে জাউ গ আগে ॥ (৩৮।৪-৬)

= হে নাবিক, চিন্তা স্থির করে নৌকা চালনা করো। অন্য উপায়ে পারে যাওয়া যায় না। নৌবাহী নৌকার গুণ টানো। সহজের কিনারা ঘেঁষে যাও, অন্য পথে যেয়ো না।

৬. চীঅ সহজে শূণ সংপূনা।

কান্ধবিয়োএঁ মা হোহি বিসন্না ॥ (৪২।২) •

= সহজের দ্বারা চিন্তা শূন্য-সম্পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং স্কন্ধ বা সংস্কার বিনষ্ট হয়েছে বলে বিষম্ব হোয়ো না।

৭. সহজ মহাতরু ফরিঅ এ তেলোএ। (৪৩।১)

= ত্রৈলোক্যে সহজরূপ মহাতরু স্ফুরিত হয়েছে।

এইসমস্ত উক্তি হতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘সহজ’ এমন একটা অবস্থা যা পৈলে সাধকের মায়িক জগতের জ্ঞান সম্পূর্ণ নষ্ট হয়। তখন আর আত্মপর ভেদজ্ঞান থাকে না, সংস্কার বিনষ্ট হয়, ভবমোহ বিলুপ্ত হয় এবং শূন্যতা-জ্ঞান লাভ হয়। সে অবস্থা যে সুখে পর্যবসিত হয় তা হচ্ছে সহজ সুখ। সাধক তখন সেই সুখে তন্ময় হয়ে উন্মত্তবৎ অবস্থান করেন, বহির্জগতের কিছুই তাঁকে সেই সুখ হতে বিচ্যুত করতে পারে না। সে অবস্থা না লাভ করতে পারলে সাধকের মুক্তিলাভ হয় না।

এই ‘সহজ’ই চর্যাপদের নানা স্থানে কখনো স্পষ্ট কখনো বা অস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এ পথের কথা আরও বিশদভাবে বলা হয়েছে দোহাকোষ নামক গ্রন্থে। এ পর্যন্ত তিনখানি সম্পূর্ণ দোহাকোষ পাওয়া গিয়েছে: তিম্নোপাদ, সরহপাদ ও কাহপাদের। তিনজনেই ছিলেন সহজসিদ্ধ। দোহাকোষের ভাষা অপভ্রংশ বা দশম-একাদশ শতকে প্রচলিত প্রাকৃত। এই দোহাকোষগুলি হতেই সহজযানের পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

সহজযানে বাহ্য অনুষ্ঠানের কোনো স্থান ছিল না। সেই জন্য সরহপাদের দোহাকোষে ব্রাহ্মণ যাজ্ঞিক একদন্তী ত্রিদন্তী জটধারী ক্ষপণক প্রভৃতি প্রত্যেককেই উপহাস করা হয়েছে। এ পথের বৌদ্ধ সাধক পূজা অর্চনা বা মন্ত্রজপ কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না-

অইরিএহিঁ উদ্দুলিঅ চ্ছারেঁ।
 সীসসু বাহিঅ এ জড় ভারেঁ।।
 ঘরহী বইসী দীবা জালী।
 কোণেহিঁ বইসী ঘন্ডা চালী।।
 অকখি নিবেসী আসন বন্ধী।
 কণ্ণেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী।।

অর্থাৎ মিথ্যাচারী জটাতার ও ভস্মলেপনে শিষ্যকে বিপথে চালনা করে। ঘরের কোণে বসে প্রদীপ জ্বেলে ঘন্টা চালনা করে মিথ্যা পূজা করতে শেখায়। চক্ষু স্থির করে আসন-বন্ধ হয়ে ধন্ধজনেরা কানে মিথ্যা খুসখুস করে মন্ত্র দেয়।

যেসব বৌদ্ধেরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে এবং সূত্রান্ত বা শাস্ত্রপাঠে সময় অতিবাহিত করে তারাও মোক্ষলাভ করে না। এমনকি মহাযান-পন্থাও সে পথের সহায়ক নয়। ধ্যান-ধারণাতেও মোক্ষলাভ হয় না—

মোক্ষ কি লত্তুই ঝাণ পবিট্টো।
 কিন্তুহ কিজ্জই কিন্তুহ নিবেজ্জঁ।
 কিন্তুহ কিজ্জই মন্তুহ সেক্কঁ।।

প্রব্রজ্যা, শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, পূজা অর্চনা প্রভৃতি সমস্তই যখন নিরর্থক তখন কিসে মোক্ষলাভ হয়? সরহপাদ বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই সে কথার উত্তর দিয়েছেন—

জহি মণ পবণ গ সঞ্চরই রবি সসি গাহ পবেস।
 তহি বঢ় চিস্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিঅ উএস।।
 এক্ক করু রে মা করু বেগ্গি জাণে গ করহ বিগ্গ।
 এহ তিহুঅণ সূঅল মহারাএঁ এক্ক করু বগ্গ।।
 আই গ অন্ত গ মজ্ঝ গউ ভব গউ গিব্বাণ।
 এহু সো পরম মহাসুহ গউ পর গউ অগ্গাণ।।
 ইন্দিঅ জখু বিলঅ গউ গ ঠিউ অগ্গ-সহাবা।
 সো হলে সহজ তণু ফুড় পুচ্ছহি গুরু পাবা।।

সরহের উপদেশ হচ্ছে— যেখানে মন-পবন সঞ্চারণ করে না, রবিশশী প্রবেশ করেনা, সেখানে চিন্তকে বিশ্রাম করতে দাও। সমস্তই এক। ‘দুই’ বা ভেদজ্ঞান পোষণ করো না ; যান বা পথও এক। সমস্ত ত্রিভুবন এই একেই পূর্ণ। আদি অন্ত বা মধ্য কিছুই নেই, জন্ম নেই, নির্বাণও নেই। পরমমহাসুখই একমাত্র সত্য, আত্মপর নেই। যখন ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হয়, আত্মজ্ঞানের স্থিতি নষ্ট হয়, তখনই সহজকায়ের স্ফূর্তি হয়। এ রহস্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করে পাওয়া যায়।

এই সহজ জ্ঞান উৎপন্ন হলে পঞ্চস্কন্ধ ও ষড়ায়তন সমস্তই বিলুপ্ত হয়। ভাব এবং অভাব কিছুই থাকে না। শূন্যতা ও করুণা উভয়ে সম্পূর্ণভাবে মিলিত হয়ে সমরস উৎপন্ন করে। চিন্তা শূন্যতা-জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়। এই অবস্থাকে অদ্বয় অবস্থা বলা হয়। সেই অবস্থায় কালজ্ঞান তিরোহিত হয়, আদি বা অন্ত থাকে না। তখন আত্মা জগৎ প্রভৃতি সমস্তই একাকার হয়। সিদ্ধ তিম্মোপাদ বলেছেন যে এই অবস্থায়—

হঁউ জগু হঁউ বুদ্ধ হঁউ নিরঞ্জন।

হঁউ অমনসিআর ভবভঞ্জন ॥

= আমিই জগৎ, আমিই বুদ্ধ আমিই নিরঞ্জন, আমিই ভবভঞ্জন অমনসিকার।

এই কথা স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য বৌদ্ধ টীকাকার গীতার অনুরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—

মদ্ভবা হি জগৎ সর্বং মদ্ভবং ভুবনত্রয়ং।

ময়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং নান্যময়ং দৃশ্যতে জগৎ ॥

অর্থাৎ জগৎ আমা হতে উদ্ভূত, ত্রিভুবন আমা হতেই উৎপন্ন; সমস্তই আমার দ্বারা পরিপূর্ণ, আমি ব্যতীত আর কিছুই নাই।

একথা হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সিদ্ধাচার্যদের ‘সহজজ্ঞান’ ছিল ‘সৌহৃৎজ্ঞানে’রই অনুরূপ। এখানেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের পুনর্মিলন ঘটেছে।

এখানে সহজসিদ্ধ সরহপাদ উপনিষদের বাণীও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন যে সহজজ্ঞান লাভ হলে অলীক ধর্মসমূহ (=বহির্জগতের যাবতীয় গুণ) মহাসুখে এমনভাবে বিলীন হয় যেমন জলে লবণ মিলিয়ে যায়—

অলীও ধম্ম মহাসুহ পইসই।

লবণো জিম পাণহি বিলিজ্জই।।

এ উক্তি উপনিষদের উক্তি। ‘স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানুলীয়েত’— অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে সমস্তই জলে লবণ মিলিয়ে যাবার মত ব্রহ্মে মিলিয়ে যায়।

ব্রহ্মজ্ঞান যেমন তুরীয় অবস্থা সহজজ্ঞানও সেইরূপ চতুর্থ এবং চরম আনন্দ। চার প্রকারের আনন্দ হচ্ছে: প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ। সাধকের অনুভূতির চারটি স্তর আছে। প্রত্যেক স্তরেই বিশেষ আনন্দ অনুভূত হয়। চতুর্থ স্তরই চরম, এবং সেই স্তরের আনন্দই হচ্ছে সহজানন্দ।

সরহপাদ এই চরমাবস্থা এমন সুন্দর উপমাবহুল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যা সাহিত্য হিসাবেও মনকে আকৃষ্ট করে—

অদ্ব্য চিত্ততরুঅরহ গাউ তিহুঅণে বিখার।

করুণা ফুল্লীফল ধরই গাউ পরন্ত উআর।।

সুগ্ন তরুৱর ফুল্লিঅউ করুণা বিবিহ বিচিহ্ন।

তহি আলমুল জো করই তসু পড়িভজ্জাই বাহ।

এক্কেসী এক্কেবি তরু তেঁ কারণে ফল এক।

এ অভিন্না জো মুগই সো ভবণিঝাণ বিমুক্ক।।

= অদ্ব্য চিত্ততরুৱর ত্রিভুবনে বিস্তার লাভ করেছে। সে তরু করুণারূপ ফুলফলে সুশোভিত, আপন-পর নেই। শূন্য তরুৱরের যে করুণা-ফুল ফোটে তা বিচিহ্ন। সে তরুর মূল শাখা কিছুই কল্পনা করা যায় না। সে তরু একমাত্র বৃক্ষ, সেই কারণে তার ফলও একটি। এই অভিন্ন তরুকে যে জানে সেই ভব নির্বাণ হতে মুক্তিলাভ করে।

ইতিপূর্বে আমরা হীনযান মহাযান কালচক্রযান বজ্রযান সহজযান প্রভৃতি যানের কথা বলেছি এবং হীনযান ও মহাযানের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক মতবাদও আলোচনা করেছি। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা নানা যান ও সম্প্রদায়গুলিকে যেরূপ সীমাবদ্ধভাবে দেখি, সেগুলি ততটা সীমাবদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না। তার কারণ

ভারতবর্ষের কোনো ধর্মই দর্শনসর্বস্ব নয়। সাধনপন্থাই ছিল ধর্মের প্রধান অঙ্গ, আর এই সাধনপন্থায় সাম্প্রদায়িক ভেদের অবকাশ অত্যন্ত কম, অধিকার-ভেদই সেখানে একমাত্র ভেদ। সে জন্য নানা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে যে একটা ঐক্য ছিল এ কথা মনে করা অসম্ভব নয়।

সদ্ধর্মপুন্ডরীক মহাযান বৌদ্ধদের একখানি অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ খৃষ্টীয় প্রথম শতকের পূর্বেই রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এ গ্রন্থে যে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত হয়েছে তা প্রাধান্যযোগ্য—

এক হি যান নয়শ্চ একঃ

একা চেয়ং দেশনা নায়কানাম্।

উপায়কৌশল্য মমেবরূপং

যন্তানি যানান্যপদর্শয়ামি ॥

অর্থাৎ যান এক, আচারও এক; নায়কের উপদেশও এক। উপায়কৌশল্যের ভেদই একমাত্র ভেদ।

নাগার্জুনও বলেছেন—

ধর্মধাতোরসংভেদাৎ ধ্যানভেদোহস্তি ন প্রভো।

যানত্রিতয়মাখ্যাভ্যং ত্বয়া সত্ত্বাবতারতঃ ॥

অর্থাৎ ধর্মধাতু বা পারমার্থিক অবস্থায় কোনো প্রভেদ নেই, সেই কারণে ধ্যান-মার্গেও কোনো ভেদ নেই। শুধু জীবের সুবিধার জন্য ত্রিযান প্রচারিত হয়েছে।

অন্যত্র বুদ্ধবচন হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে—

যানানাং নাস্তি বৈ নিষ্ঠা যাবচ্চিস্তং প্রবর্ততে।

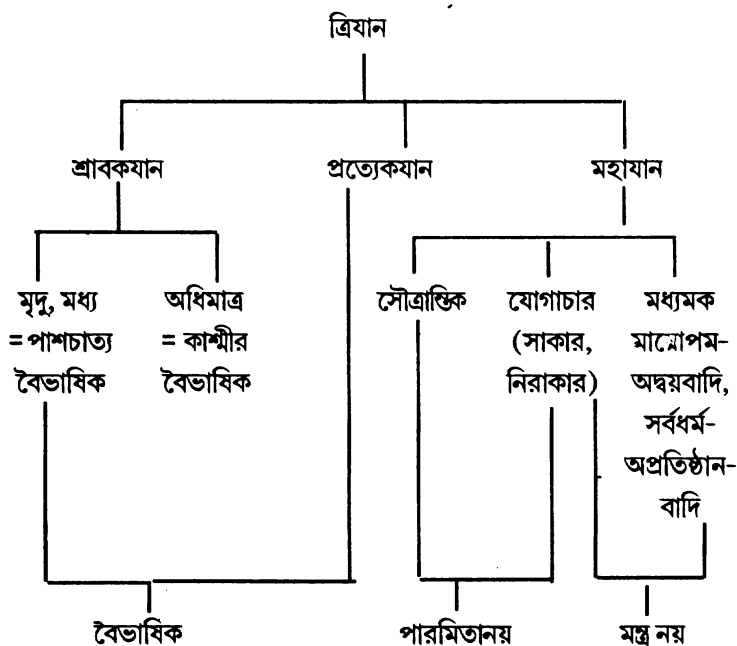
পর্যবস্তে তু বৈ চিস্তে ন যানং নাপি য়্যয়িনঃ ॥

অর্থাৎ যতক্ষণ চিস্ত আছে ততক্ষণই যানের প্রয়োজন; প্রকৃত পক্ষে যান বলে কিছু নেই। চিস্তা পরাবৃন্তি লাভ করলে যানও থাকে না, যান অনুসরণ করাও থাকে না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের একজন বৌদ্ধসাধক, অদ্বয়বজ্র, তাঁর তত্ত্বরত্নাবলী নামক গ্রন্থে নানা যানের কথা আলোচনা করে সর্ব-বৌদ্ধ-সমন্বেষের পথ নির্দেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন যে, সাধারণতঃ মনে করা হয় যে যান তিন প্রকার: শ্রাবকযান প্রত্যেকযান ও মহাযান। এই তিনটি যান চারটি ধারায় বিভক্ত: বৈভাষিক সৌত্রান্তিক যোগাচার ও মধ্যমক। শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান বৈভাষিক ধারাকে অবলম্বন করে প্রচারিত হয়েছে। শ্রাবকযান তিন রকমের: মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র। পাশ্চাত্য বৈভাষিক হচ্ছে মৃদু-মধ্য এবং কাশ্মীর বৈভাষিক হচ্ছে অধিমাত্র।

মহাযান দ্বিবিধ: পারমিতানয় ও মন্ত্রনয়। সৌত্রান্তিক যোগাচার ও মধ্যমক পারমিতানয়কেই প্রচার করেছে। মন্ত্রনয় শুধু যোগাচার ও মধ্যমক অবলম্বন করে প্রচারিত হয়েছে। যোগাচার দুই প্রকারের: সাকার ও নিরাকার, এবং মধ্যমকও দ্বিবিধ: মায়োপমঅদ্বয়বাদি এবং সর্বধর্মপ্রতিষ্ঠানবাদি।



এ সমস্ত আলোচনার পর অদ্বয়বজ্র দেখিয়েছেন যে পরমার্থ লাভ শুধু মহাযান অবলম্বন করেই হয়। তাহলে শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান শিক্ষা দিবার কি প্রয়োজন ছিল? তার উত্তরে অদ্বয়বজ্র বলেছেন—‘মহাযানপ্রাপনার্থং এব শ্রাবকপ্রত্যেকযান-সোপাননির্মাণাৎ’ অর্থাৎ মহাযানে পৌঁছবার জন্য অন্য দুই যান হচ্ছে সোপান মাত্র। এ মতের স্বপক্ষে তিনি বুদ্ধবচনও উদ্ধৃত করেছেন—

আদিকার্মিকসত্ত্বস্য পরমার্থাবতারণে

উপায়স্বয়ং সম্বুদ্ধৈঃ সোপানমিব নির্মিতঃ

পরিশিষ্ট

১. পালি বৌদ্ধ সাহিত্য

থেরবাদ

সিংহল, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, কাম্বোডিয়া

পালি সাহিত্যে যে কিম্বদন্তী লিপিবদ্ধ হয়েছে তা বিশ্বাস করলে বলতে হবে যে বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজগৃহে বৈভার পর্বতে সপ্তপর্ণী নামক গুহায় বৌদ্ধাচার্যদের প্রথম সমিতি আহূত হয়। এই সমিতিতে বুদ্ধবচন সংগ্রহ ও রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা হয়। বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ যেসমস্ত সূত্র বিবৃত করেন তাকে 'সুত্রপিটক' (পালি সুত্তপিটক) আখ্যা দেওয়া হয়। উপালি সমস্ত 'বিনয়পিটক' বিবৃত করেন।

প্রায় দু শ বছর পরে মৌর্যবংশীয় রাজা অশোকের সময় তৃতীয় বৌদ্ধ সমিতি আহূত হয়। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অশোকের গুরু মোগ্গলিপুত্ত তিস্স (= মৌদগল্যপুত্র তিষ্য)। এই সভায় সুত্তপিটক ও বিনয়পিটকের পুনরাবৃত্তি হয় এবং অভিধম্মপিটক প্রথম প্রচারিত হয়। অভিধম্মপিটকের শেষ গ্রন্থ কথাবস্তু (= কথাবস্তু) তিস্স নিজে সঙ্কলন করেন।

তিস্সের অন্যতম শিষ্য মহিন্দ্র (মহেন্দ্র) অশোকের আদেশে এই ত্রিপিটক, সুত্ত বিনয় ও অভিধম্ম, নিয়ে সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে যান। সে দেশে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর আদেশে এই ত্রিপিটক প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। সিংহলে এই ত্রিপিটকের মধ্যে বিনয় প্রধান, সুত্তপিটক দ্বিতীয় এবং অভিধম্ম তৃতীয় স্থান অধিকার করে। এই ত্রিপিটক হচ্ছে বুদ্ধবচন; এ ছাড়া পালিভাষায় আরও গ্রন্থ আছে, সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল।

১. বিনয়পিটক। তিনভাগে বিভক্ত : ক. সুত্তবিভঙ্গ, খ. খন্দক, এবং গ.

পরিবারপাঠ।

ক. সুত্তবিভঙ্গের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে পাতিমোক্খ বা পাটিমোক্খ। ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীর আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য পাটিমোক্কে ২২৭টি অনুশাসন লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই অনুশাসনগুলির ব্যাখ্যা করবার জন্যই সুত্তবিভঙ্গ লিখিত। সুত্তবিভঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত: ১. মহাবিভঙ্গ—ভিক্ষুদের আচার-ব্যবহারের আলোচনা। ২. ভিক্ষুণী-বিভঙ্গ—ভিক্ষুণীদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় আলোচনা।

খ. খন্দক দুইভাগে বিভক্ত : ১. মহাবগ্গ—ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্বন্ধীয় প্রধান বিষয়গুলির বিশদ বর্ণনা। ২. চুল্লবগ্গ—বিনয় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলির আলোচনা। সুত্তবিভঙ্গ পাটিমোক্খ অবলম্বন করে লিখিত, খন্দক কস্মবাচা অবলম্বন করে লিখিত। কস্মবাচা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর দৈনিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করবার নিয়মাবলী।

গ. পরিবারপাঠ—বিনয় সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরমালা, সূচী, পরিশিষ্ট ইত্যাদি।

২. সুত্তপিটক। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য নানা বুদ্ধবচন ও বুদ্ধপ্রোক্ত ঘটনা পরম্পরায় এই গ্রন্থ গঠিত। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত—

ক. দীঘনিকায় (= দীর্ঘনিকায়); এই নিকায়ে যেসমস্ত সূত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে: বম্মজালসুত্ত, সামঞ-ফলসুত্ত, অশ্বঠটসুত্ত, সোনদম্ভ, কুটদম্ভ, মহাবলি, জালিয়, কস্সপসীহনাদ, পোঠঠপাদ, সুভ, কেবড্ড, লোহিচ্চ, তেবিজ্জ, মহাপদান, মহাপরিনিব্বাণ, মহাসুদস্সন, জনবসভ, মহাগোবিন্দ, মহাসময়, সঙ্কপঞ্হ, মহাসতিপঠান, পায়াসি, পাটিক, উদুস্বরিক সিহনাদ, চক্কবত্তিসিহনাদ, অগ্গঞ্হ, সম্পসাদনীয়, পাসাদিক, লক্ষণ, সিংগালোবাদ, আতনাটিয়, সংগীতি, এবং দসুত্তর।

খ. মজ্জিম নিকায় (= মধ্যম) তিন ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগে পঞ্চাশটি সুত্ত আছে।

গ. সংযুক্ত নিকায় (= সংযুক্ত)। সংযুক্ত পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। বর্গগুলির নাম—সগাথবর্গ, নিদান, খন্ধ, সড়ায়তন, মহাবর্গ। প্রত্যেক বর্গেই দশ-বারোটি সুত্ত আছে।

ঘ. অংগুত্তর নিকায়। অংগুত্তর ১১টি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে নিপাত বলা হয়। নিপাতগুলি বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্রগুলির সংখ্যানুযায়ী রচিত। ১১টি নিপাত আছে : এক-নিপাত, দুক, তিক, চতুস্ক, পঞ্চক, ছক, সত্তক, অট্টক, নবক, দশক, একাদশক। দুক-নিপাতে দু রকম পাপের কথা রয়েছে— যে পাপের ফল এ জীবনে ভোগ করতে হয়, এবং যার ফল পর জীবনে ভোগ করা হয়। ত্রিক-নিপাতে কায়বাক্চিৎ সম্বন্ধীয় তিন রকম পাপের কথা রয়েছে। সমস্ত নিপাতগুলিই এই নিয়মানুসারে লিখিত।

ঙ. খুদ্দক নিকায় (ক্ষুদ্রক)। খুদ্দক নিকায় ১৬ খানি বিভিন্ন গ্রন্থের সমষ্টি: খুদ্দক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্তনিপাত, বিমানবস্তু, পেতবস্তু, থেরগাথা, থেরিগাথা, জাতক, মহানিদেস, চুল্লনিদেস, পটিসম্বুদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংস, চরিয়পিটক। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ধম্মপদ, ইতিবুত্তক সুত্তনিপাত, থেরগাথা, থেরিগাথা ও জাতক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন।

৩. অভিধম্মপিটক। অভিধম্মপিটকে থেরবাদ সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ বিবৃত হয়েছে। এ পিটকে সাতখানি গ্রন্থ আছে ১. ধম্মসংগাণি, ২. বিভঙ্গ, ৩. কথাবস্তু, ৪. পুণ্ণল পঞঞত্তি, ৫. ধাতু-কথা, ৬. যমক, ৭. পঠটান।

যেসমস্ত প্রাচীন পালিগ্রন্থ ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয় তন্মধ্যে মিলিন্দপঞ্হো উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের ইতিহাসের দিক দিয়ে এ গ্রন্থের মূল্য

পিটিকাস্তর্গত অনেক গ্রন্থের চেয়েও বেশি।

৪. টীকা। পালি ত্রিপিটকের টীকাকারদের মধ্যে তিন জনের নাম উল্লেখযোগ্য—বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল। বুদ্ধদত্ত ছিলেন দাক্ষিণাত্যে চোলদেশের উরগপুরের লোক, বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক। উভয়েই খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে বর্তমান ছিলেন। বুদ্ধঘোষের জন্ম মগধে, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার পর সিংহলে যান। ধর্মপালও তামিল দেশ হতে সিংহলে যান। এইসমস্ত টীকাকারদের মধ্যে বুদ্ধঘোষই সর্ব-প্রধান।

বুদ্ধঘোষ বিনয় ও অভিধম্মের টীকা রচনা করেন। এইসমস্ত টীকার মধ্যে অভিধম্মাবতার, বৃপারূপবিভাগ, বিনয়বিনিচ্চয় ও উত্তরবিনিচ্চয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুখানি অভিধম্ম ও অন্য দুখানি বিনয়পিটকের নানা বিষয় অবলম্বনে রচিত।

বুদ্ধঘোষ যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন তাতে সন্দেহ নাই, কারণ তিনি যেসব টীকা রচনা করেছিলেন সেগুলি টীকার চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান। তাঁর প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্যে সমস্ত ত্রিপিটক সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম গ্রন্থ বিসুদ্ধিমগ্গ (= বিশুদ্ধিমার্গ) সমস্ত ত্রিপিটক অবলম্বনে লিখিত। থেরবাদ সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এ গ্রন্থের মূল্য সর্বাপেক্ষা বেশি। বুদ্ধঘোষের আর একখানি প্রধান গ্রন্থ সমস্তপাসাদিকা হচ্ছে সমগ্র বিনয়পিটকের বিস্তৃত টীকা। এ গ্রন্থে শুধু যে বিনয় সম্বন্ধীয় নানা বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে তা নয়। বৌদ্ধসংঘের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধেও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয়ান্তর্গত পাটিমোক্তের উপর বুদ্ধঘোষ পৃথক টীকা রচনা করেন, এ টীকার নাম কংখাবিতরনী।

বুদ্ধঘোষ সুত্তপিটকের নানা নিকায়ের ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত দীঘ-নিকায়ের টীকার নাম সুমঙ্গল-বিলাসিনী, মজ্জম, মজ্ঝিম নিকায়ের টীকা হচ্ছে

পপঞ্চ-সুদনী, সংযুক্ত নিকায়ের টীকা—সারথপকাসনী, অঙ্গুত্তর নিকায়েব টীকা - মনোরথপূরনী; বুদ্ধঘোষ খুদ্দক-নিকায়ের মাত্র তিনখানি গ্রন্থের টীকা রচনা করেন—খুদ্দক পাঠের টীকা হচ্ছে পরমথজোতিক, ধম্মপদের টীকা—ধম্মপদথ কথা এবং সুত্তনিপাতের—সুত্তনিপাতথকথা।

বুদ্ধঘোষ অভিধম্মপিটকের যে টীকা লেখেন তার নাম অথশালিনী। এ ছাড়া জাতক প্রভৃতি অন্যান্য গ্রন্থেরও বুদ্ধঘোষের নামাঙ্কিত টীকা পাওয়া যায়, তবে সেসব টীকার রচনা-ভঙ্গী দেখে মনে হয় যে সেগুলি খুব সম্ভব বুদ্ধঘোষ নামধারী অন্য কোন ব্যক্তির রচনা।

ধম্মপাল, বিমাববথু, পেত্তবথু, থেরগাথা ও থেরিগাথার টীকা রচনা করেন। এ ছাড়া চরিয়াপিটকের পরমথদীপনী নামক টীকাও লেখেন। তবে এসব রচনা বুদ্ধঘোষের টীকার তুলনায় অনেক কম মূল্যবান।

পালি ভাষায় রচিত ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও মহাবংস ও দীপবংসের উল্লেখ না করে পারা যায় না। এ দুখানি গ্রন্থ পিটকান্তর্গত নয়, টীকা পদবাচ্যও নয়। এ দুখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, কিন্তু শুধু ভারতবর্ষ ও সিংহলের প্রাচীন রাজবংশের রাজবংশাবলীই নয়। সেই সঙ্গে বুদ্ধের সময় হতে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ধারারও ইঙ্গিত রয়েছে। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এ গ্রন্থ দুখানি অতি মূল্যবান।

২. তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্য

মূলসর্বাঙ্গিবাদ, মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ইত্যাদি

তিব্বত, ভূটান, সিকিম

পূর্বেই বলেছি যে খৃষ্টীয় সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বহু সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। এসমস্ত গ্রন্থ কাশ্মীর, নেপাল, নালন্দা, বিক্রমশীলা, জগদল প্রভৃতি বিহার থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। অনেক সময় ঐসব দেশের বৌদ্ধবিহারে অবস্থান কালে তিব্বতী পণ্ডিতগণ ভারতীয় পণ্ডিতদের সহায়তায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। এই তিব্বতী অনূদিত সাহিত্যের সংস্কৃত মূল অধুনা লুপ্তপ্রায়। সামান্য কয়েকখানি মূল গ্রন্থ নেপাল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র।

তিব্বতী অনূদিত সাহিত্য দু ভাগে বিভক্ত: কাঞ্জুর (Bkash hgyur) এবং তাঞ্জুর (Bstan hgyur)। কাঞ্জুর হচ্ছে ‘বুদ্ধবচন’; তাঞ্জুর ‘শাস্ত্র’, অর্থাৎ বুদ্ধের পরবর্তী পণ্ডিতদের রচিত প্রামাণিক গ্রন্থাবলী।

১. কাঞ্জুর। কাঞ্জুর বা বুদ্ধবচন নয় ভাগে বিভক্ত— বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, অবতংসক, রত্নকূট, সূত্রবর্গ, শতসহস্রতন্ত্র, প্রাচীন তন্ত্র, কালচক্র ও ধারণী-সংগ্রহ। এই বিভাগ যে কৃত্রিম তা নামগুলি দেখলেই বোঝা যায়। পালি চীনা কিংবা নেপালী বৌদ্ধসাহিত্যের বিষয়-বিভাগের সঙ্গে এর কোনো মিল নাই। ক. বিনয়—তিব্বতী বিনয় হচ্ছে মূলসর্বাঙ্গিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়। এ বিনয়ের উদ্ভব কাশ্মীরে, নেপাল থেকে আবিষ্কৃত দিব্যাবদান নামক গ্রন্থ এই বিনয়ের মূল গ্রন্থের খন্ডিতাংশ মাত্র। সম্প্রতি কাশ্মীর হতে এই বিনয়ের মূল গ্রন্থের কতকগুলি অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতী অনুবাদে আছে বিনয়বস্ত্র, প্রাতিমোক্ষ সূত্র, বিনয়বিভঙ্গ, ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষুণী বিনয়-বিভঙ্গ, বিনয় ক্ষুদ্রকবস্ত্র এবং বিনয়-উত্তর গ্রন্থ। এইসমস্ত গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ ১৩ খানি তিব্বতী মুদ্রিত পুঁথিতে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক পুঁথির পত্র-সংখ্যা কিঞ্চিদধিক ৩০০। খ. প্রজ্ঞাপারমিতা মহাযানসূত্র। প্রজ্ঞাপারমিতায় সর্বাপেক্ষা বৃহৎগ্রন্থ হচ্ছে ‘শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’ এ গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ ১৩ খানি পুঁথিতে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক পুঁথির পত্রসংখ্যা প্রায় ৪০০। এ ছাড়া ‘পঞ্চসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা’, ‘দশসাহস্রিকা —’ ‘অষ্টসাহস্রিকা —’ ‘সপ্তশতিকা —’ ‘পঞ্চশতিকা —’ প্রভৃতি নানা

সংক্ষিপ্ত-সারেরও তিব্বতী অনুবাদ আছে। প্রজ্ঞাপারমিতার অন্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ‘বজ্রচ্ছেদিকা’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ. অবতংস—৪ খানি পুঁথিতে সম্পূর্ণ। এ একখানি বিপুল গ্রন্থ, এর সম্পূর্ণ নাম ‘বুদ্ধাবতংসক নাম মহাবৈপুল্য সূত্র’। নেপালে এই গ্রন্থেরই অংশ বিশেষ গন্ডবাহু নামে প্রচলিত। ঘ. রত্নকূট—এ বিভাগের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে ‘মহারত্নকূট’। অন্যান্য অপ্রসিদ্ধ সূত্রও এই বিভাগে স্থান পেয়েছে। সমস্তই মহাযান গ্রন্থ। ঙ. সূত্রবর্গ—এ বিভাগের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে— ভদ্রকল্লিক নাম মহাযান সূত্র, ললিতবিস্তর, সুখাবতীব্যুহ, সুরঙ্গম সমাধি, মহাসন্নিপাতসূত্র প্রভৃতি মহাযান গ্রন্থের অনুবাদ আছে। চীনা ত্রিপিটকে এ বিভাগের নাম মহাসন্নিপাত। তবে চীনা মহাসন্নিপাত থেকে তিব্বতী সূত্রবর্গ অনেক বড়, এ বিভাগে মোট সূত্র সংখ্যা ২৬৬। চ. তন্ত্র-শতসহস্র এ বিভাগে প্রায় ৪৬৮ খানি বৌদ্ধতন্ত্র গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। এসমস্ত তন্ত্র মহাযান, বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের। কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থের নাম করলেই এসব গ্রন্থের স্বরূপ বোঝা যাবে— কালচক্রোত্তর-তন্ত্র, অভিধানোত্তর তন্ত্র, বজ্রডাক নাম উত্তরতন্ত্র, বুদ্ধকপাল নাম যোগিনীতন্ত্ররাজ, ভূতডামর মহাতন্ত্ররাজ, ইত্যাদি। ছ. প্রাচীন তন্ত্র—এ বিভাগে কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ তন্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ স্থান পেয়েছে। জ. কালচক্র—এ বিভাগে একখানি মাত্র গ্রন্থ— বিমলপ্রভা-নাম-লঘুকালচক্র তন্ত্ররাজ-টীকা। এ গ্রন্থের পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। ঝ. ধারণী-সংগ্রহ—এ বিভাগের মোট গ্রন্থ সংখ্যা ২৬৪ খানি।

২. তাজুর। পূর্বেই বলেছি যে তাজুর হচ্ছে শাস্ত্র। তাজুর কাঞ্জুর হতে অনেক বড়। কাঞ্জুরের গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮। কিন্তু তাজুরের গ্রন্থসংখ্যা ৩৪৫৯। তাজুর ১৭ ভাগে বিভক্ত: ক. স্তোত্র—এইসব স্তোত্রের মধ্যে নাগার্জুন ও অশ্ব ঘোষের নামাঙ্কিত অনেক স্তোত্রের অনুবাদ আছে। অনেকের মতে মাতৃচৈট অশ্ব ঘোষের নামান্তর। এই মাতৃচৈটের রচিত অনেকগুলি স্তোত্রের তিব্বতী অনুবাদ আছে। এইসব স্তোত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি যে উচ্চাঙ্গের কাব্য ছিল তা নূতন আবিষ্কৃত কয়েকখানি মূলগ্রন্থ হতেই বোঝা যায়। খ. তন্ত্র—এসমস্ত তন্ত্র বুদ্ধবচন নয়। বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সিদ্ধাচার্যদের রচনা। এগুলি বেশির ভাগ মূল তন্ত্রের টীকা-

টিপ্পনী। তাঞ্জুরের এই অংশই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মূল্যবান। মোট গ্রন্থসংখ্যার মধ্যে ২৬০৫ খানিই এই অংশে স্থান পেয়েছে। বজ্রযান ও সহজযানের সিদ্ধাচার্যদের রচিত যেসমস্ত গ্রন্থের কথা বলেছি সেগুলির অনুবাদ এই অংশেই পাওয়া যায়। গ. প্রজ্ঞাপারমিতা— এই অংশে কাঞ্জুরে সন্নিবিষ্ট প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের নানা টীকা-টিপ্পনী স্থান পেয়েছে। এই জাতীয় একখানি প্রধান গ্রন্থ ‘অভিসময়া-লঙ্কার’ নামক গ্রন্থের মূল সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঘ. মাধ্যমিক-নাগার্জুনের প্রতিষ্ঠিত মধ্যমক দর্শন সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। এ অংশের গ্রন্থাবলীর মধ্যে নাগার্জুনের নিজের রচিত মূলমধ্যমক-কারিকা, বিগ্রহব্যবর্তনী, প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এ গুলির মূল প্রকাশিত হয়েছে। ঙ. সূত্রবৃদ্ধি— কাঞ্জুরে উল্লিখিত নানা সূত্রের টীকা। চ. বিজ্ঞানবাদ— অসঙ্গ বসুবন্ধু প্রভৃতি আচার্যদের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানবাদ দর্শনের নানা প্রামাণিক গ্রন্থ—যেমন অসঙ্গের সূত্রালংকার, মধ্যমবিভঙ্গ, যোগাচার্য ভুমিশাস্ত্র ইত্যাদি। ছ. অভিধর্ম— সর্বাঙ্গিবাদের অভিধর্মকোষ ও তৎ-সম্বন্ধীয় নানা গ্রন্থ। জ. বিনয়—বিনয়, প্রতিমোক্ষ প্রভৃতির টীকা। ঝ. জাতক— এই অংশে প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্য। ঞ. লেখমালা— এ অংশে নাগার্জুনের সুহৃৎলেখ এবং ঐ জাতীয় শিষ্যলেখ বিমলরত্নলেখ প্রভৃতি গ্রন্থ স্থান পেয়েছে। ট. ন্যায়শাস্ত্র, প্রমাণসমুচ্চয়, আলম্বন-পরীক্ষা, বাদন্যায় প্রভৃতি বৌদ্ধন্যায়ের গ্রন্থ। ঠ. শব্দশাস্ত্র— নানা ব্যাকরণ গ্রন্থ, চন্দ্রগোমিনের চান্দ্রব্যাকরণ, কলাপসূত্র, দুর্গসিংহের কলাপবৃদ্ধি, অমরকোষ, কাব্যদর্শ ইত্যাদি। ড. চিকিৎসা বিদ্যা— বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, ও অন্যান্য গ্রন্থ। চ. শিল্পশাস্ত্র— প্রতিমা লক্ষণ, চিত্র লক্ষণ, প্রভৃতি। গ. সাধারণ— নীতিশাস্ত্র, চাণক্যনীতিশাস্ত্র, শালিহোত্র-আয়ুর্বেদসংহিতা ইত্যাদি। ত. নানার্থ— নিঘণ্ট, ব্যাকরণ, অর্থবিনিশ্চয় প্রভৃতি। থ. দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রণীত নানা গ্রন্থ।

৩. চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য

চীন, কোরিয়া, জাপান, আনাম

বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রথম প্রচারিত হয় খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে এবং

সে ধর্ম চীনদেশে প্রায় এক শ বছরের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগেই বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির চীনা অনুবাদ-কার্য আরম্ভ হয়, আর এই অনুবাদ-কার্য প্রায় খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চলে। ফলে থেরবাদ সম্প্রদায়ের পালি সাহিত্য ব্যতীত প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ের বৌদ্ধশাস্ত্রই চীনা অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে।

মহাযান, মহাযানের অন্তর্গত মাধ্যমিক, যোগাচার, বিজ্ঞানবাদ, বজ্রযান এবং হীনযানের অন্তর্গত সর্বাঙ্গবাদ, মূলসর্বাঙ্গবাদ, মহাসাংঘিক, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, ধর্মগুপ্ত, হৈমবত প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থই চীনাভাষায় অনূদিত হয়। সেই কারণে চীনা বৌদ্ধ সাহিত্য হতে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপক পরিচয় পাই তা অন্য কোনো বৌদ্ধ সাহিত্য হতে পাই না।

এই চীনা বৌদ্ধসাহিত্য ঢীকাটিপ্পনী সমেত কয়েক বছর আগে জাপান হতে এক নূতন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে। এ সংস্করণের নাম 'তাইশো' ত্রিপিটক (Taisho Issaikyo); এ সংস্করণ মোট ৫৫ খন্ডে সম্পূর্ণ, প্রত্যেক খন্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ১২০০। সুতরাং এই সংস্করণ কিঞ্চিদধিক ৬০,০০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

প্রাচীন প্রথানুসারে এই সাহিত্য চার ভাগে বিভক্ত: সূত্রপিটক, বিনয়পিটক, অভিধর্মপিটক ও সংযুক্ত পিটক।

১. সূত্র পিটক— সূত্রগুলি প্রধানতঃ দুভাগে বিভক্ত— মহাযান ও হীনযান। ক. মহাযান সূত্র। মহাযান সূত্র পাঁচ প্রকারের: প্রজ্ঞাপারমিতা, রত্নকূট, মহাসম্মিপাত, অবতংসক এবং নির্বাণ। ১. প্রজ্ঞাপারমিতার মধ্যে প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা-, দশসাহস্রিকা-, বজ্রচ্ছেদিকা ইত্যাদি; ২. রত্নকূটের প্রধান গ্রন্থ মহারত্নকূট সূত্র ৪৯ খানি বিভিন্ন সূত্রের সমষ্টি। এইসমস্ত সূত্রের মধ্যে কয়েকখানি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে— অমিতাযুস সূত্র, সমন্তমুখ পরিবর্ত, পিতাপুত্র সমাগম, উগ্রপরিপৃচ্ছা, সুরতপরিপৃচ্ছা, ইত্যাদি; ৩.

মহাসন্নিপাতের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে মহাবৈপুল্য মহাসন্নিপাতসূত্র এবং এ ছাড়া চন্দ্রগর্ভসূত্র, সূর্যগর্ভসূত্র, আকাশগর্ভ, ক্ষিতিগর্ভ, প্রভৃতিও আছে; ৪. অবতংসক বিভাগের মূলগ্রন্থ হচ্ছে বুদ্ধা-বতংসক মহাবৈপুল্যসূত্র। প্রধান গ্রন্থগুলির মধ্যে দশভূমিকসূত্র উল্লেখযোগ্য; ৫. নির্বাণ বিভাগের মূলগ্রন্থ হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ সূত্র। হীনযান সূত্রপিটকের মহাপরিনির্বাণ সূত্র হতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মহাযানের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; ৬. আর এক শ্রেণীর মহাযান সূত্র আছে যার কোনো সাধারণ আখ্যা দেওয়া হয় নি। সদ্ধর্মপুন্ডরীক, সুবর্ণপ্রভাসসূত্র, কঙ্কণাপুন্ডরীক, বিমলকীর্তিনির্দেশ, সন্ধিনির্মোচনসূত্র, ললিতবিস্তর, লংকাবতারসূত্র, মৈত্রেয়ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহাযান গ্রন্থ ও নানা ধারণীসংগ্রহের অনুবাদ এই বিভাগে সন্নিবিষ্ট হয়েছে; ৭. এসমস্ত সূত্র ছাড়া আরও অনেক অপ্রসিদ্ধ মহাযান সূত্রের অনুবাদ নিয়ে আর একটি বিভাগ গঠিত হয়েছে। এ বিভাগের সুরঙ্গমসমাধি, অদ্ভুতধর্মপর্যায়, মহাবেরোচনাভিসম্বোধি প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। খ. হীনযান সূত্র। হীনযানসূত্র মূলতঃ সংস্কৃত সূত্রপিটকের চীনা অনুবাদ। এই সংস্কৃত সূত্রপিটক পালি সূত্রপিটকের অনুরূপ এবং খুব সম্ভব সর্বাঙ্গবাদ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। অন্য কোনো সম্প্রদায় এ সূত্রপিটক স্বীকার করে নিয়েছিল কি না তা বর্তমানে স্থির করা সম্ভব নয়। এই সূত্রপিটকের মূল অধুনা লুপ্ত। মধ্যএশিয়া হতে কয়েকখানি মূল গ্রন্থের খন্ডিতাংশ মাত্র আবিস্কৃত হয়েছে।

এই সূত্রপিটক মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত: মধ্যমাগম, সংযুক্তাগম, একোত্তরাগম ও দীর্ঘাগম। মধ্যমাগম ১৮ টি বর্গ ও ২২২ স্তবকে বিভক্ত। একোত্তরাগমের সূত্রসংখ্যা ৫২ এবং দীর্ঘাগমের সূত্রসংখ্যা ৩০। এই চারটি আগম পালি সূত্রপিটকের অন্তর্গত মজ্জিম অঙ্গুত্তর, সংযুক্ত এবং দীঘনিকায়ের সঙ্গে তুলনীয়।

এই চারটি আগমের সম্পূর্ণ চীনা অনুবাদ ছাড়া আগমান্তর্গত নানা সূত্রের অন্য অনুবাদও আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদক এসমস্ত অনুবাদ করেছিলেন। চীনা সূত্রপিটকে এ ছাড়া প্রায় ৩০০ গ্রন্থ আছে যা উপরোক্ত কোনো বিভাগের অন্তর্গত নয় এবং যা মহাযান কি হীনযান তা চীনা অনুবাদকও

সঠিক নির্ধারণ করতে পারেন নি।

২. বিনয়পিটক — অন্যান্য পিটকের ন্যায় চীনা বিনয় পিটক ও দুভাগে বিভক্ত। মহাযান এবং হীনযান। ক. মহাযান বিনয়পিটকের অস্তিত্ব এক হিসাবে অসম্ভব। মহাযানপন্থা হচ্ছে তাঁদের জন্য যাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে উন্নত, সুতরাং তাঁদের জন্য হীনযান বিনয় ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নাই। মহাযান বিনয়ের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে ব্রহ্মাজালসূত্র ও বোধিসত্ত্ব-প্রাতিমোক্ষ। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে প্রধান হচ্ছে যোগাচার ভূমিশাস্ত্রের কয়েকটি অধ্যায়ের চীনা অনুবাদ। এসমস্ত গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের কর্তব্যগুলিই নির্দিষ্ট হয়েছে। খ. হীনযান বিনয়— পূর্বেই বলেছি যে নানা সম্প্রদায়ের বিনয় পিটক চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এইসমস্ত বিনয় নিয়েই হীনযান বিনয় গঠিত। এই বিভাগের প্রধান গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য—১. সর্বাঙ্গিবাদ বিনয় ২. মহাসাংঘিক বিনয়, ৩. ধর্মগুপ্ত বিনয়, ৪. মহীশাসক বিনয়, ৫. মূলসর্বাঙ্গিবাদ বিনয়, ৬. হৈমবত বিনয়। এ ছাড়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রতিমোক্ষের নানা চীনা অনুবাদও আছে।

৩. অভিধর্ম পিটক — অভিধর্ম দুভাগে বিভক্ত— মহাযান ও হীনযান অভিধর্ম পিটক। ক. মহাযান অভিধর্ম — মহাযান অভিধর্ম মূলতঃ নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, স্থিরমতি প্রভৃতি আচার্যদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে গঠিত। সেই জন্য মাধ্যমিক, যোগাচার প্রভৃতি দার্শনিক সম্প্রদায়ের সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থই এই অংশে স্থান পেয়েছে। নাগার্জুনের প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে : ১. মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র-শাস্ত্র, ২. মধ্যমক শাস্ত্র, ৩. দশভূমি বিভাষা শাস্ত্র, ৪. প্রজ্ঞাপ্রদীপশাস্ত্র, ৫. দ্বাদশ নিকায় শাস্ত্র, ৬. ন্যায়দ্বার তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি। অসঙ্গের প্রধান গ্রন্থ— ১. যোগাচার ভূমিশাস্ত্র, ২. মহাযান সম্প্রিগ্রহ শাস্ত্র, ৩. সূত্রালংকার টীকা, ৪. বজ্রচ্ছেদিকা প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র-শাস্ত্র ইত্যাদি। বসুবন্ধুর প্রধান গ্রন্থ : ১. বিজ্ঞানমাত্র সিদ্ধি-শাস্ত্র, ২. ত্রিংশিকা কারিকা, ৩. বিংশিকা কারিকা, ৪. মধ্যান্ত বিভাগ শাস্ত্র, ইত্যাদি। অশ্বঘোষের : ১. মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র, ২. সূত্রালংকার ইত্যাদি। খ. হীনযান অভিধর্ম— হীনযান অভিধর্ম মূলতঃ সর্বাঙ্গিবাদ সম্প্রদায়ের অভিধর্ম পিটক। এ পিটকেও পালি অভিধর্মের অনুরূপ সাতখানি

গ্রন্থ আছে: ১. সংগীতিপর্যায় শাস্ত্র, ২. প্রকরণপাদ, ৩. বিজ্ঞানকায়পাদ, ৪. ধাতুকায়পাদ, ৫. জ্ঞানপ্রস্থান শাস্ত্র, ৬. ধর্ম-বুদ্ধপাদ শাস্ত্র, ৭. প্রজ্ঞাতিসারশাস্ত্র। সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের আচার্যেরা এক সময় সমস্ত অভিধর্মকে সহজবোধ্য করবার জন্য এবং অন্যান্য মত খন্ডন করবার জন্য মহাবিভাষা-শাস্ত্র রচনা করেন। যেসকল সর্বাস্তিবাদীরা এ গ্রন্থকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করলেন তাঁদের নাম হল বৈভাষিক। এই বিরাট মহাবিভাষা-শাস্ত্রের চীনা-অনুবাদও হীনযান-অভিধর্মে স্থান পেয়েছে। মহাবিভাষা-শাস্ত্র বস্তুতঃ জ্ঞান-প্রস্থান শাস্ত্রেরই টীকা। এই সর্বাস্তিবাদ অভিধর্ম অবলম্বন করে বসুবন্ধু অভিধর্মকোষ শাস্ত্র নামক এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থও সর্বাস্তিবাদীদের প্রামাণিক গ্রন্থ।

হীনযান অভিধর্মের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কাশ্মীরী হরিবর্মার ‘সত্যসিদ্ধিশাস্ত্র’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থ কোন সম্প্রদায়ের অভিধর্ম গ্রন্থ ছিল তা সঠিক জানা যায় না। তবে নানা সম্প্রদায়ের অভিধর্মের তুলনামূলক বিচারে এ গ্রন্থ বিশেষ প্রয়োজনীয়।

৪. সংযুক্ত পিটক— বস্তুতঃ এ নামে কোনো পিটক ছিল না। চীনারা নানা ভারতীয় গ্রন্থের অনুবাদ, এবং চীনা বৌদ্ধচার্যদের টীকা-টিপ্পনী ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিয়ে এই সংযুক্ত সংগ্রহের সৃষ্টি করেছে। এ সংগ্রহে গ্রন্থসংখ্যা ৩৫০। জাতক, অবদান, ধর্মপদ, বুদ্ধচরিত, ধারণীসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের চীনা অনুবাদ এই বিভাগে স্থান পেয়েছে।

ত্রিপিটকের ‘তাইশো’ সংস্করণে এই প্রাচীন গ্রন্থবিন্যাসের ধারা অনুসৃত হয় নি, তার প্রধান কারণ এই যে অনূদিত গ্রন্থগুলির প্রায় অর্ধাংশই কোনো সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নাই, সুতরাং সেগুলি নিয়ে যে বিরাট সংযুক্তপিটকের সৃষ্টি করতে হয় তাতে বিশৃঙ্খলাই বাড়বার সম্ভবনা।

৪. নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য

নেপাল

যেসমস্ত তিব্বতী ও চীনা অনুবাদের কথা উল্লেখ করেছি তার মূল গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না। যে কয়েকখানি মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় তা নেপাল হতেই আবিষ্কৃত হয়েছে। নেপালে বৌদ্ধধর্মের ধারা অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও তা লুপ্ত হয় নি। সে দেশের আবহাওয়া প্রাচীন পুঁথিপত্র রক্ষা করা সম্ভব ছিল বলেই সে দেশে এখনো অনেক পুঁথি পাওয়া যায়। নেপাল হতে আবিষ্কৃত যেসমস্ত পুঁথি প্রকাশিত হয়েছে তন্মধ্যে দিব্যাবদান, মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, সদ্ধর্মপুন্ডরীক, অভিধর্মকোষব্যাক্য্য, অসঙ্গের সূত্রালঙ্কার, বন্ধুবন্ধুর বিংশিকা ত্রিংশিকা ও মধ্যান্ত-বিভঙ্গশাস্ত্র, নাগার্জুনের মধ্যমকশাস্ত্র, প্রভৃতি প্রধান। বজ্রযান ও সহজযানেরও নানা পুঁথি নেপালে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যেগুলি প্রকাশিত হয়েছে তার পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি।

নেপালের বৌদ্ধচার্যেরা বৌদ্ধসূত্র ও শাস্ত্র পুঁথিতেই সংরক্ষণ করে এসেছে। বহু প্রাচীনকাল হতেই নেপালের বৌদ্ধেরা বৌদ্ধধর্মের একটি বিশিষ্ট ধারা রক্ষা করেছে। তাদের মতে বৌদ্ধশাস্ত্র ৯ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে ‘ব্যাকরণ’ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ৯টি ব্যাকরণ হচ্ছে: ১. প্রজ্ঞাপারমিতা, ২. গন্ডব্যূহ, ৩. দশভূমীস্বর, ৪. সমাধিরাজ, ৫. লঙ্কাবতার, ৬. সদ্ধর্মপুন্ডরীক, ৭. তথাগতগুহ্যক, ৮. ললিতবিস্তর, ৯. সুবর্ণপ্রভাস।

মহাযানপন্থী নেপালী বৌদ্ধদের এই ‘নব্যব্যাকরণে’র মধ্যে সবগুলিই পাওয়া যায় এবং ‘সমাধিরাজ’ ও ‘তথাগতগুহ্যক’ ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলি সমস্তই প্রকাশিত হয়েছে।

৫. মঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য

মঙ্গোলীয়দের মধ্যে খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে কুবলাই খাঁ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন

এবং তাঁর চেষ্টায় সমস্ত মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। খৃস্টীয় সপ্তদশ শতকে তিব্বতী হতে সমস্ত কাঙ্গুর এবং অষ্টাদশ শতকে কাঙ্গুরের টীকাটিপ্পনী, ও তাঙ্গুরের অন্তর্গত গ্রন্থাবলী অনূদিত হয়। সুতরাং মঙ্গোলীয় বৌদ্ধসাহিত্য সর্বতোভাবে তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্যেরই অনুরূপ।

৬. মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য

বিগত শতকের শেষ ভাগ হতে মধ্য-এশিয়ায় অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয়। নানা দেশের পণ্ডিতেরা মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে অনুসন্ধান করে যেসমস্ত পুঁথিপত্র অবিস্কার করেছেন তা এখনোও সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নি। যেটুকু আলোচনা করা হয়েছে তা হতে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে খৃস্টীয় প্রথম শতক হতে আরম্ভ করে অষ্টম-নবম শতক পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। যেসমস্ত পুঁথিপত্র পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে নানা মহাযান-সূত্রের খন্ডিতাংশ আছে, যথা— প্রজ্ঞাপারমিতা, বজ্রচ্ছেদিকা, চন্দ্রগর্ভ, সূর্যগর্ভ ইত্যাদি। হীনযানের সর্বাঙ্গবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়ের খন্ডিতাংশ, সম্পূর্ণ প্রাতিমোক্ষসূত্র এবং সূত্রপিটকের নানা সূত্রের খন্ডিতাংশও পাওয়া গিয়েছে।

মহাযান ও হীনযানের সংস্কৃত শাস্ত্র গ্রন্থের খন্ডিতাংশ ছাড়া মধ্য-এশিয়ার নানা প্রাচীন প্রাদেশিক ভাষায় অনূদিত বৌদ্ধগ্রন্থও পাওয়া যায়। যেসমস্ত ভাষায় এসব অনুবাদ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে—প্রাচীন খোটানী, সুগ্দিয়, কুচীয়, তুর্কী ইত্যাদি।

৭. ধম্মপদ

ধম্মপদ বৌদ্ধগ্রন্থ না হলে এদেশে তা গীতার চেয়ে কম আদর পেত বলে মনে হয় না। ধম্মপদ হচ্ছে পালি ভাষায় লিখিত। অনেকে অনুমান করেন যে পালি-ভাষা মথুরা ও অবন্তী প্রদেশের প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় মার্জিত রূপ। যাঁরা সংস্কৃত জানেন তাঁদের পক্ষে এ ভাষা শিক্ষা মোটেই কষ্টকর নয়, বরং অতি

. এ সম্বন্ধে আমার 'ভারত ও মধ্যএশিয়া' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সহজে ও অল্প-সময়েই তাঁরা তা শিখতে পারেন।

কিন্তু ধম্মপদ পড়তে পালি না জানলেও চলে। কারণ সে গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেও লিখিত হয়েছিল। সংস্কৃত ধম্মপদকে উদানবর্গ বলা হত। আর এই উদানবর্গ বহুবার চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে উদানবর্গের সংস্কৃত মূল মধ্য-এশিয়ার নানা স্থানে বালুকাস্ত্রুপের মধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধপ্রতিষ্ঠান সমূহের ধ্বংসাবশেষের ভিতর কুড়িয়ে পাওয়া যায়। প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থই বর্তমানে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এখন সংস্কৃত ভাষাতেই ধম্মপদ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ কিস্বদন্তী মাৰ্ঘলে বলতে হবে যে—সংস্কৃত উদানবর্গ খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের। কনিষ্কের রাজত্বকালে ধর্মত্রাত নামক এক বৌদ্ধ পণ্ডিত এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধম্মপদ যে প্রাকৃত ভাষাতে লেখা হয়েছিল তারও প্রমাণ আছে। মধ্য-এশিয়ায় প্রাকৃত ধম্মপদের এক খন্ডিত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। এ প্রাকৃত পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের প্রাচীন কথ্য ভাষা। সমগ্র ধম্মপদই যে সে ভাষায় লিখিত হয়েছিল তার প্রমাণ সেই পুঁথি হতেই পাওয়া যায়।

ধম্মপদের এই তিন গ্রন্থ হতে একটি নমুনা দিলেই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র ধরা যাবে—

পালি ।। অপ্রমাদো অমৃতপদং পমাদো মচ্ছুনো পদং ।

অপ্রমত্তা ন মীয়ন্তি যে প্রমত্তা যথা মতা ।।

প্রাকৃত ।। অপ্রমদু অমুতপদ প্রমদু মুচ্ছুনো পদ ।

অপ্রমত ন মীয়তি যে প্রমত যধ মৃতু ।।

সংস্কৃত ।। অপ্রমাদো হ্যমৃতপদং প্রমাদো মৃত্যুনঃ পদম্ ।

অপ্রমত্তা ন প্রিয়ন্তে যে প্রমত্তাঃ সদা মৃত্যুঃ ।।

= অপ্রমাদে অমৃত লাভ হয় আর প্রমাদে মৃত্যু ।

যাঁরা অপ্রমত্তভাবে জীবন যাপন করেন তাঁদের মৃত্যু হয় না। কিন্তু যাঁরা প্রমত্ত তাঁদের সর্বদাই মৃত্যু হয়।

ধম্মপদের রচয়িতা কে তা জানা যায় না। বৌদ্ধ-সাহিত্যে সে গ্রন্থকে বুদ্ধবাণী বলা হয়েছে। বুদ্ধদেবের নিজের রচনা না হলেও সে গ্রন্থ যে বৌদ্ধ সাহিত্যের একখানি প্রাচীনতম গ্রন্থ তাতে সন্দেহ নাই। ধম্মপদের বিষয়বস্তু এবং তার সহজ রচনাভঙ্গী সে গ্রন্থকে ভারতীয় সাহিত্যে অমর করে রাখবে। আর যে গ্রন্থ প্রাচীন-কালে প্রায় সমগ্র এশিয়াতে নানা জাতির সমাদর লাভ করেছিল তা যে এখনও ধর্ম-পিপাসুর চিত্তকে উদ্বেলিত করতে পারবে না এবং সাহিত্য-রসিকের মনে আনন্দরস সঞ্চার করতে পারবে না, একথা মনে করবার কোনো হেতু নাই।

মহাবোধি বুক এজেন্সীর প্রকাশিত পুস্তক তালিকা

মহামানব গৌতমবুদ্ধ (দিঃ সং)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১২০
মহামানব গৌতমবুদ্ধ (হিন্দী)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	২০০
গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
বৌদ্ধ সাহিত্য	ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮০
বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	ডঃ মণিকুন্তলা হালদার	১৫০
বৌদ্ধ শিল্প ও স্থাপত্য	ডঃ সাধন চন্দ্র সরকার	১৪০
দীঘ নিকায়	ভিক্ষু শীলভদ্র	২০০
থেরীগাথা	ভিক্ষু শীলভদ্র	৬০
প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ	শ্রী এস কে দাসগুপ্ত	১০০
ধম্মপদ (বাংলা, পালি, সংস্কৃত)	চারুচন্দ্র বসু	৬০
ধম্মপদ (পালি, বাংলা)	ভিক্ষু শীলভদ্র	৩০
বুদ্ধ ধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ	ডঃ আশা দাশ	১০০
সীমলীব্রত কথা	বিশুদ্ধাচার্য হুবির	১৫
অশোকচরিত	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	৩০
বৌদ্ধ গান ও দোহা	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৩০০
বৌদ্ধ রমণী	ডঃ বিমলাচরণ লাহা	৭৫
বুদ্ধবাণী	ভিক্ষু শীলভদ্র	৯০
বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা	শ্রী শরৎচন্দ্র দাস	৪০০
ধম্মপদটীকথা (১মঃ যমক বর্গ)	শ্রী শীলালঙ্কার মহাহুবির	১৩০
ধম্মপদটীকথা (২য়ঃ অঙ্গমাদ বর্গ)	ধর্মকীর্ত্তি মহাহুবির	১৩০
ধম্মপদটীকথা (৩য়ঃ চিত্ত, পুষ্প বর্গ)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদটীকথা (৪র্থঃ বাল, পণ্ডিত বর্গ)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	১৫০
ধম্মপদটীকথা (৫মঃ অরহন্ত, সহস্র, পাপ, দন্ত বর্গ)	ডঃ সুকোমল চৌধুরী	২০০
অশোকলিপি	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
বুদ্ধকথা	ডঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	১০০
সিদ্ধার্থ (কাব্য)	শ্রী হৃষিকেশ ভট্টাচার্য	১৫০
সূক্ত নিপাত	ভিক্ষু শীলভদ্র	১২০
ভক্তিশতকম্ ও বৃত্তমালাখ্যা	রামচন্দ্র কবিভারতী	৫০
বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর		
জাতীয় জীবনে রামায়ণ	ডঃ বাণী দাশ	২৫০
সৌন্দর্যনন্দ কাব্য	শ্রী বিমলাচরণ লাহা	১০০
বুদ্ধদেব	শ্রী সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	১০০
কচ্চায়ন ব্যাকরণ	শ্রী বংশদীপ মহাহুবির	১৫০
বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য	শ্রী প্রবোধ চন্দ্র বাকচি	৭৫